চরৈবেতি
বাতায়ন

Disappearing Chicago

বাতায়ন

Ithaka

As you set out for Ithaka
hope your road is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians, Cyclops,
angry Poseidon — don't be afraid of them:
you'll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body.
Laistrygonians, Cyclops,
wild Poseidon — you won't encounter them
unless you bring them along inside your soul,
unless your soul sets them up in front of you.

C. P. CAVAFY

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৬

EDITORS
Ranjita Chattopadhyay, Chicago, IL
Jill Charles, IL, USA

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

ACKNOWLEDGEMENT
Saumen Chattopdahyay — front cover and inside back cover
Kathy Powers — inside front cover
Tirthankar Banerjee — back cover
Bhaswati Laha : for helping with the inside cover page

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: editor@batayan.org

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response. We wish you all a happy festive season and enjoy our sixth issue of **"BATAYAN"**.

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সূচীপত্র

চরৈবেতি ১
ধীমান চক্রবর্তী

নিরুদ্দেশ ২
সৌগত দত্ত হাজরা

বাতিঘর ৩
দেবাশীষ ব্যানার্জী

নিস্ ৪
আনন্দ সেন

প্লুটো ৫
পিনাকী গুহ

নীল আকাশের নীচে ৬
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

মৃগদেব ১৩
ইন্দ্রাণী দত্ত

সতী ১৬
দেবীপ্রিয়া রায়

নোনি, ছোট্ট মনি আর অনেকটা - - - - গর্ব ১৯
শাশ্বতী ভট্টাচার্য্য

সুডাইনা, কোবে, আর কোঙ্গান ২৭
শুভ্র দত্ত

ওরা কাজ করে ২৯
সুজয় দত্ত

আমার পুজো, ওদের পুজো ৩৫
সৈকত দে

মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা ৩৭
নন্দিনী নাগ সারকার

কলকাতার প্রথম মিষ্টি মল্ ৩৮
বিশাখা দত্ত

Solis Invicti ৪১
Souvik Dutta

Arrival: Movie Review ৪৩
Jill Charles

Highland Park Woods ৪৪
Jill Charles

Flights of Fancy ৪৫
David Nekimken

Mango King of Trees ৪৬
Menachem Emanuel

Communication of the Self ৪৮
Allen F. McNair

Black Pearl ৪৯
Mekhala Banerjee

Greetings ৫৩
Bani Bhattacharyya

In the field ৫৪
Viola Lee

IRIS ৫৬
Tinamaria Penn

Liam, 18 Months Old ৫৭
Bakul Banerjee

Regarding Utopia ৫৮
M. C. Rydel

Crossroads ৫৯
Sujay Datta

Twas the Night Before Christmas 1956 ৬০
Maureen Peifer

Hiking the Whites in Appalachian Trail ৬২
Saumen Chattopadhyay

সম্পাদকীয়

‘বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ ।’ প্রখ্যাত সাহিত্যিক যাযাবরের এই মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি বিতর্কিত হলেও প্রথম অংশটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই কারও মনে । একুশ শতক বিজ্ঞানের যুগ, গতির যুগ । সকলে তাই চলেছে । এই গতিময়তা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে শুধু মানুষ নয়, সব প্রাণীরই ধর্ম । থেমে থাকলে সে তখন শ্যাওলা ধরা নুড়িপাথর । তার রঙ, আকৃতি সবই শ্যাওলার তলায় চাপা পড়া । তাই চরৈবেতি --- এগিয়ে চল । গন্তব্য ? অনেক সময় গন্তব্য স্থির থাকলে গন্তব্যে পৌঁছনটাই চলার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় । তখন পথের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করে আছে যে বিস্ময়, যে সৌন্দর্য আর যেসব সম্ভাবনা তাদের স্বাগত জানানর মানসিকতা হারিয়ে যায় কিছুটা । তখনই গোড়ার উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় অংশটি সত্যি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ।

পথশেষের কথা না ভেবেই পথকে ভালবেসেছেন আমাদের প্রাণের কবি । গীতাঞ্জলিতে গেয়েছেন, ‘পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া ।’ বিভিন্ন গানে তিনি নিজেকে ‘পান্থজন’, ‘পথিকজন’ বা শুধু ‘পথিক’ বলেছেন । এ ভাবনা খুব নতুন কিছু নয় । দেশকাল নির্বিশেষে সাধুসন্তরা, আউল-বাউলরা, সুফি-দরবেশরা, মরমিয়া কবিরা নিজেদের প্রেমের করুণ রঙিন অথচ কঠিন পথের পথিক বলে ভেবেছেন । পথ চলার আনন্দটুকু পাথেয় করে চালিয়ে গেছেন তাঁদের সাধনা ।

‘পথের শেষ কোথায় ?’ চলতে গিয়ে এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক । কিন্তু সেই ভাবনার বশবর্ত্তী হয়ে চলার পথের আনন্দটা যেন বাদ না পড়ে যায় । আর এটাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের বড় পাওয়া । একটা বছর শেষ হতে চলেছে । বিগত বছরে আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সামাজিক জীবনে ও জাতীয় জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি, হারিয়েওছি কিছু । যা হারিয়েছি তা থেকেও হয় তো পেয়েছি এমন কিছু যার মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের নতুন সম্ভাবনার বীজ । কিন্তু আসুন, এই মুহূর্ত্তে পাওয়া-হারানোর হিসেব না করে আমরা এগিয়ে চলি সামনের দিকে । বরণ করে নিই একটি নতুন বছরকে । চরৈবেতি ।

সামনে এগিয়ে চলার আশা নিয়ে বাতায়নের ‘চরৈবেতি’ সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম । নানা বিষয় নিয়ে নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করার আর সেইসব ভাবনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে শুরু হয়েছে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস । আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের এই যে পথ চলা এতে চ্যালেঞ্জ আছে বৈ কি ! এ পথ কোথায় কিভাবে মোড় নেবে তা আমরা কেউই জানি না । আমাদের এবারের প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । পথ চলেছে । সে পথ আপত দৃষ্টিতে খুব সরল নয় । তবে তার কোন বাঁকে কি সম্পদ কিভাবে লুকিয়ে আছে তা আমরা কেউই জানি না । থেমে থাকলে সেই সব সম্পদ অধরাই রয়ে যাবে । তাই আমরা চলব । আপনাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা, সহযোগিতা এবং আমাদের প্রতি আস্থা পাথেয় করে এগিয়ে যাব সামনের দিকে । বাধা বিপত্তি আসুক । ভরসা রাখি সকলে একসাথে পার হয়ে যাব সে সব । আগামী বছরে আরও সুন্দর করে এবং আরও নিয়মিত ভাবে বাতায়ন আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রইল ।

সকলে ভাল থাকবেন । এই বছরের বাকী দিনগুলো সমোরোহের মধ্যে কাটান । ভরে থাকুন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির সাধনায় । বই পড়ুন, গান শুনুন, নাটক-সিনেমা দেখুন । চড়ুইভাতি, মেলা এসবে যোগ দিন । এক কথায় উদ্‌যাপন করুন ২০১৬-র বিদায় । আগামী বছর আপনাদের সকলের খুব ভাল কাটুক । বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল ।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

ডিসেম্বর ২০, ২০১৬
অরোরা, ইলিনয়

কবিতা

চরৈবেতি

ধীমান চক্রবর্তী, অরোরা, ইলিনয়

থামতে ব'ল না, চলতেই দাও
আমাদের প্রিয় গাড়ি,
দূরতর হোক সে দেশ
যেখানে আমরা দিয়েছি পাড়ি ।

হাত ধরো নিঃসংশয়,
বুঝুক যার যা ইচ্ছা, তাই;
পাথেয় বলতে শুধু
আমাদের ভ্রমণলিপ্সাটাই ।

জানি না পথের ঠিক-ভুল,
বা কোথায় গতির সীমানা টানব -
জানা-টা কি খুব জরুরী ?
বলো, কেন-ই বা এত জানব ?

লেশমাত্রও তাড়া নেই,
নেই আগ্রহ গন্তব্যে,
পথ চলাটাই উদ্দেশ্য
প্রিয়ে, ক্ষমা দাও মন্তব্যে ।

পথ আমাদের সঙ্গীত
আর সঙ্গী কয়েক পদ্য,
বৃষ্টি শোনায় বাজনা
মেঘ সুরকার অনবদ্য ।

স্বপ্নেরা বুনো জেব্রা
যখন আকাশ জ্যোৎস্নামগ্ন,
ডাক দেয় ধূ ধূ প্রান্তর
আর বনভূমি সংলগ্ন ।

সোজা পথ ছেড়ে আজ নয়
হব বিপথেই দিগ্‌ভ্রান্ত,
নিষেধের খাঁচা ভেঙে হোক্
যত ইচ্ছারা নিষ্ক্রান্ত ।

বিপদের ভয় কম নয়
তবু ভয়ের বিপদ ততোধিক
যদি জুড়ে থাকে সব চিন্তা
শুধু সামলে চলতে শত দিক ।

সমীচীন এসব ভাবনা ?
সে কথা অন্য কখনও ভাবব
আজ শুধু তুমি, আমি, ছুটি,
আর দু-এক পশ্‌লা কাব্য ।

নিরুদ্দেশ

সৌগত দত্ত হাজরা, মিশিগান

এগিয়ে চলেছে তরী --
যেন জীবনেরই মতো ধীর সুনিশ্চিত লয়ে
অজানা ভবিষ্যৎ অভিমুখে ।
দিগন্তে মিলায় তটরেখা --
অস্পষ্ট অতীত যেন, বিস্মৃতির কুয়াশায় ঘেরা ।
সামনে চলেছে তরী, বিগতকে পিছে ফেলে রেখে ।

একটি, দুটি, তিনটি --
ক্রমশঃ অজস্র ঢেউ তুলে,
প্রগাঢ় নীলের বুকে দুধসাদা ফেনারেখা এঁকে,
জীবনেরই মতো যেন কালের অতল জলধিতে
স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে চায় ।
নিজেরই চারপাশে বহু সাধ, বহু যত্নে তোলা
ছোট্ট সে আলোড়ন, কটি মাত্র ঢেউ --
নিমেষে মিলিয়ে যায়, সময় রাখেনা মনে তাকে ।

শাশ্বত হবেনা জানে, তবু থেমে থাকে না এ তরী ।
কী এক অমোঘ টানে অজানা সমাপ্তিরেখা পানে
এগিয়ে চলেছে শুধু -- গতি আছে, গন্তব্য নেই ।

কবিতা

বাতিঘর

দেবাশীষ ব্যানার্জী, এ্যান আরবর, মিশিগান

এক ভিনদেশী ধূমকেতু আমি
হাজার আলোকবর্ষ ধরে
ফিরেছি নিরুদ্দেশ
ছায়াপথের অনন্ত কুহরে
একাকী, শূন্য পথচরে

অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের অচেনা আলোয়
ক্ষণিক আলোকিত আমি
অচিরেই আবৃত
তামসী শূন্য বলয়ে

দেহ আমার ক্ষত বিক্ষত
উল্কারাশির আবাহনে
তবু, অনন্ত পথ চলা
অমৃতের সন্ধানে

এক ভিনদেশী ধূমকেতু আমি
অসীম রহস্যের ব্যবধানে
বিস্মৃত এক শ্রোতা
মহাশূন্যের এক প্রান্তে
শুনি নিশ্চিন্ত, তুমি একা

তোমার বিস্তীর্ণ প্রাণের উঠোনে
অনাবৃত, অবহেলিত
শতছিন্ন তোমার নীলাভ দেহ
শৃঙ্গ হয়ে মরুতে ফেরে
নিরন্তর হাহাকার
বিষাক্ত বায়ুর রসায়নে

তোমার দেহের শিরা উপশিরায়
এক বিস্ময় ইতিহাস বয়
যেখানে এক সিন্ধু প্রাণবিন্দু
একা একা পথ হারায়

এ সৃষ্টির আয়োজনে
ধ্বংসের মিনার সারি সারি
ছদ্মবেশী যন্ত্রের প্রয়োজনে
নির্জনে, শূন্যপ্রায় বালুঘড়ি

এক ভিনদেশী ধূমকেতু আমি
বৃথা আজীবন যাযাবর
শূন্যতম সমুদ্রে
ভালো থেকো, সুখে থেকো
একাকিনী, তুমি বাতিঘর

নিস্

আনন্দ সেন, মিশিগান

অন্ধকারের রঙ বাকি সব রঙ খেয়ে বসে থাকে
কালো মুখ তার তোলেনি সে আকাশের দিকে ।
তুললে দেখতে পেত মুঠো মুঠো তারাদের ফাঁকে
সহস্র বাজির আলো ফেটে গ্যাছে আকাশের বাঁকে ।
সে আলো চুপিসাড়ে কিশোরের গালবেয়ে ওঠে
সে আলো নতজানু কাল বিয়ে হওয়া মেয়েটির ঠোঁটে ।
সে আলোতে মাখামাখি হাসি আর খুশি
আঙ্গুলে জড়ানো আঙ্গুল সে আলো দ্যাখে পাশাপাশি ।
গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্নেরাও আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ভালবাসা, সেও ছিল আলোতে আদর জড়িয়ে ।
আলোতে মশগুল ছিল, তাই দ্যাখেনি আঁধার
কোথা থেকে ছুটে এসে করে ছারখার ।
ঘাতকের তরবারি আকাশের বুক চিরে দিয়ে যায়
খুনি মুখ তার ঢেকে রেখেছিল আঁধারের পর্দায় ।
নইলে দেখতে পেত চাঁদ লেগে আছে নিভন্ত বারুদের গায়ে
আলো ছুঁয়ে গায়ে রাজপথে নিষ্প্রাণ শিশুটির পায়ে ।
অন্ধকারের জীব, কখনও আলোতে করেনি স্নানও
করলে জানতে পেত আলো নিভে যায় না কখনও ।
সৃষ্টির আদিকাল থেকে চাঁদ ওঠে,
জ্যোৎস্নারা বরাবর আলো ঠিকরোয়
হাজার বছর ধরে সে আলোয় পথ হাঁটে লোক,
ভোর খুঁজে পায়, আঁধারের সীমানা পেরোয় ।

কবিতা

প্লুটো

পিনাকী গুহ, শিকাগো, ইলিনয়

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ছেলে বলে,
প্লুটো আর গ্রহ নয় সেটা জানো ?
নয়ে নবগ্রহ পড়া মনটা ধাক্কা খেল
কি কান্ড ! গুগুলেও দেখি সেটাই শেখানো ।

বিজ্ঞান ছোটে অশ্বমেধের ঘোড়া,
কাল অজানা, আজকেই হয় জানা ।
তবু পরিবার থেকে নির্বাসনের আগে,
তার মত কেউ জিজ্ঞেস করবে না ?

কি যায় আসে ? ছেলে সান্ত্বনা দেয়,
বামন গ্রহ, অবয়ব খুব ছোট ।
তাই গ্রহ সংসারে অপাংক্তেয় সে আজ,
ছিন্নমূল হল আমাদের প্লুটো ।

প্লুটোর স্মৃতিতে টাইম মেশিনে ছুটি,
ক্লাস ফাইভের সিলেবাসে মুখ গুঁজি ।
ঝিঁঝিঁর কোরাস, লো-ভোল্টেজের আলোয়
আলো-আধাঁরির ছেলেবেলাটাকে খুঁজি ।

লাভ নেই জানি উই ধরা বই ঘেঁটে,
গুগুল করি, ছেলেকে নিয়ে কাছে,
দেখি, গ্রহপুঞ্জের সংসারে আজ প্লুটো
নিশ্চই বেশ সুখে শান্তিতে আছে !

ভ্রমণ কাহিনী

নীল আকাশের নীচে

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়, অরোরা, ইলিনয়

প্রিয় তন্ময়, (Sunday, August 14, 2016)

আমার মাথার উপর উদার আকাশ এখন, খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছি প্রাণভরে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। মুখে চোখে লোণা জলের ছিটে লাগছে। পায়ের নীচে বালি আর ঝিনুককুঁচির ভিজে রুক্ষতা। হাওয়ায় ভেসে আসছে মাছ মাছ গন্ধ।

আজ বিকেল তিনটে নাগাদ এসে পৌঁছেছি ফ্লোরিডার দক্ষিণ পশ্চিমের ছোট্ট এই দ্বীপটিতে। নাম Captiva Island। Chicago থেকে উড়ে এলাম ফোর্ট মায়ার্স বিমানবন্দরে। সেখান থেকে গাড়ীতে ঘন্টাখানেকের রাস্তা হল Sanibel island। Sanibel island-এর দক্ষিণে Captiva island। স্যানিবেল আর ক্যাপটিভা দুই যমজ দ্বীপ যেন। দুটির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে গাড়ীতে দু মিনিটে পার হওয়া যায় এমন একটি সেতু। ছোট্ট দ্বীপ ক্যাপটিভা – লম্বায় প্রায় চার মাইল, আর যেখানে সে সবথেকে চমড়া সেখানে তার পরিসর আধ মাইল মতো।

হোটেলের ঘরে জিনিসপত্র রেখে, lunch সেরে বেরিয়ে পড়েছি। এখন বিকেলও প্রায় গড়িয়ে গেছে। সাগরের সঙ্গে এবারের সফরে এই প্রথম দেখা আমার। যতদূর চোখ যায় জল আর বালির সীমারেখা অনবরত ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র আর সৈকতের এ এক অদ্ভুত খেলা – বার বার দেখলেও যা পুরনো হয় না।

এই খেলা দেখতে দেখতে কি মনে হচ্ছে জান ? এই যে অনন্ত আকাশ আর অসীম জলরাশি, এর কতটা কার অধিকারে তা কিসের নিরিখে মাপা হয় ? ঢেউ-এর অবিরাম ওঠাপড়া, আকাশে নরম আলো, ভেজা বালিতে সমুদ্র কাঁকড়ার চলার চিহ্ন, দূরে দু-একটা পেলিকানের হাল্কাভাবে জলকে ছুঁয়ে যাওয়া – সবই একটা সুতোয় গাঁথা। একই সমগ্রের অংশ। তাও এত দ্বন্দ্ব কেন বল তো মানুষে মানুষে ? হয়তো অনেকটা আকাশ, অনেকটা আলো আর অনেকটা জল একসঙ্গে দেখলে নিজেদের মনটাও রোজকার আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, রাগ অনুরাগ ভুলে সেই পূর্ণের অনুভব পায় খানিকটা, তাই তখন অধিকারের লড়াই-এর অর্থহীনতাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

আকাশে এখন অদ্ভুত আলো। কিছুটা আকাশ মেঘে ঢাকা। কালচে নীল, জমাট মেঘ। মেঘ চিরে থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুতের রেখা। আর একদিকে সূর্য পাটে যাওয়ার প্রস্তুতি চলেছে। জলে কমলা আভা, আকাশের আয়নায় রঙের খেলা। সমুদ্র সেখানে বুকে ধরেছে মেঘের ছায়া, সেখানে আবার জল কালো। কালো জলের উপর থেকে থেকেই ভেসে উঠছে আরও গাঢ় কালো রঙের অবয়ব। খানিকটা তাকিয়ে থাকার পরে বুঝলাম দুটো ডলফিন মনের আনন্দে খেলা করছে সাগর জলে। মেঘ, রোদ, আলো, ছায়া মিলেমিশে একাকার এখন। জল কোথাও নীল, কোথাও কালচে সবুজ, কোথাও আবার ঝিকিমিকি কমলা। ভেজা বালিতেও নানা রঙের প্রতিফলন। দূরে প্রায় ডুবে যাওয়া সূর্যের সামনে দিয়ে পালতোলা নৌকা চলেছে। ঠিক যেন সিনেমার দৃশ্য। সূর্যের মতো এতবড় আলোকচিত্রী আর কে আছে বল তো ?

দিগন্তে সেখানে আকাশ আর জলে গলাগলি, সেখানে এখন শুধু গাঢ় নীল দাগ, কালো ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনী। আকাশের যে পারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তার অপর পারে তালগাছ, নারকেল গাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে। জলচর পাখীরা ঘরে ফিরছে পড়ন্ত সূর্যের সব আলোটুকু পাখায় মেখে।

আজ তোমাকে ফোন করা হল না। ফোনে চারপাশের ছবিটা ভাল করে আঁকতে পারতাম না। তার থেকে চিঠি লেখার বিকল্পটাই নিলাম। অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। এই ছুটিতে রোজ তোমাকে একটা করে চিঠি লিখব ভেবেছি। শুধু চিঠি-ফোন বা e-mail নয়। কিছু ঝিনুক কুড়িয়েছি। দেখাব ফিরে গিয়ে। ভাল থেক।

তোমার নীল

On Monday, August 15, 2016 (tbose@yahoo.com) wrote

Dear Neel,

How are you ? Did you reach safely ? I have been wanting to talk to you. Did you forget me ? How ? I know. The water and sand, the sky and the waves, the sea shells, the crimson sunset .... they have so much to offer. I, only with longing in my heart, am no match for the abundance of nature. Call me as soon as you get a chance. Please check your e-mail and reply soon.

প্রিয় তন্ময়,

তোমার ই-মেল পড়লাম । ঠিক করেছি এই ছুটিতে তোমাকে কোন ই-মেল লিখব না । চিঠি লিখছি তার পরিবর্ত্তে । পড়তে পাবে । তবে দিনকতক পরে । শেষে জল, বালির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এ কিরকম ছেলেমানুষি তোমার ? দেনাপাওনার হিসেব এখন থাক । বরং গল্প শোন একটা ।

নিউ ইংল্যান্ড-এ ছিমছাম, পরিপাটি এক কটেজ । ছোট্ট সেই কটেজে থাকে এক দুধবরণ কন্যে । দুধবরণ কন্যে তার সোনার বরণ চুল; জানালা দিয়ে দূরে সাগরপারে তাকিয়ে রোজ বেশ খানিকটা সময় কাটে কন্যের । কেন বল তো ? সুদূর দক্ষিণ অতলান্তিকের বুকে জাহাজে পাড়ি দিয়েছে তার প্রিয়তম । কন্যে তাই তাকিয়ে থাকে সাগরপানে । চোখের দৃষ্টি উদাস; সোনার বরণ চুলের ঢাল এলোমেলো করে দেয় সাগরের হাওয়া । দিন যায়, মাস যায় । সাগরের জলে খেলা করে যে আলো ক্রমশ তার রঙ বদলে যায় । বদলে যায় হাওয়ার গতি । একদিন দূরে আকাশের দক্ষিণ কোণে দেখা দেয় একটুকরো কালো মেঘ । ভয়ে দুরুদুরু কন্যার বুক । সে রাতে ঘুম আসে না তার চোখে । অনেক রাত পর্যন্ত জানালার ধারে গালে হাত রেখে বসে থাকে সে । আকাশ জল জুড়ে শুধু অন্ধকার । সে অন্ধকারে আরও ঘনিয়ে আসে তার ভয় । হঠাৎ দূরে একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু দেখতে পায় সে । কালো জলরাশির বুক চিরে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে সে বিন্দু । কন্যে চমকে ওঠে তবে কি তার প্রতীক্ষার অবসান হল এতদিনে ? জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে রাতের নীরবতাকে ভেঙে । তাহলে তার আশা বাস্তবে রূপায়িত হল শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে ঘরে ফিরল তার নাবিক । এবারে মিলনের পালা ।

প্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে নাবিক । প্রশ্ন করে, ‘‘বল তো, সাগর ছেঁচে তোমার জন্য কি এনেছি এবারে ?’’ অবাক চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কন্যে বলে, ‘‘জানি না তো ।’’ ‘‘চোখ বন্ধ কর । হাত পাত ।’’

পদ্মকলির মতো আঙুলগুলি মেলে ধরে কন্যে চোখ বন্ধ করে । হাতে ঠেকে মসৃণ, ঠান্ডা একটা স্পর্শ । চোখ খুলে সে দেখে দুধসাদা এক শাঁখ । তার গা থেকে পিছলে পড়ছে লালচে গোলাপী আভা । চোখ ফেরাতে পারে না দুধবরণ কন্যে । বিস্ময়ের ঘোর কাটতে শাঁখটি পাশে রেখে প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হয় সে । প্রিয়তম তার কানে কানে বলে চলে তার নিজের এবারের সাগর অভিযানের অদ্ভুত সব গল্প ।

Sailor is valentine – উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথাটির প্রচলন ছিল খুব । দক্ষিণ অতলান্তিক বা ক্যারিবিয়ান সাগরে পাড়ি দিত যে সব নাবিকেরা, প্রিয়জনের জন্য নিয়ে আসত এই বিশেষ উপহার । চারকোণা, পাঁচকোণা বা ডিম্বাকৃতি কাঠ আর কাঁচের বাক্স । তার ভিতরে ঝিনুকের আলপনা । নানা আকারের নানা রঙের সব ঝিনুক ।

Captiva Island এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল National Seashell Museum । ফ্লোরিডা ছাড়াও পৃথিবীর নানা জায়গার সমুদ্র সৈকত থেকে আহরণ করা sea shell এর একটি সংগ্রহশালা এটি । এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর থেকে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে জলরাশি, উষ্ণতা আর অগভীরতার কারণে সেখানে জন্ম নেয় অজস্র প্রবাল, শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি আর শামুক । তাদের রঙ, আকার ও আয়তনের বৈচিত্র্য দেখলে তাক লেগে যায় । গতকাল সন্ধ্যেবেলা যখন সমুদ্রের তীরে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম কানে বাজছিল একটাই সুর । খোলা আকাশ, অসীম জলরাশি, বিস্তীর্ণ বালুচর, তালগাছের সারি, ভেসে ওঠা ডলফিন, পেলিকান সব যেন মিলেমিশে একটাই ছবি । আজ এই shell museum-এ দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে বিপরীত কথা । এখানে প্রাণের বহুবিচিত্র প্রকাশ । নানারকম shell, তাদের নানারকম নাম – Horse conch, lightning whelk, triton's trrumpet, queen's helmet – আরও অনেক নাম । বেশিরভাগ নামই shell-টির আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মেলান । কোনোটা আবার প্রথম যে সংগ্রাহকের হাতে পড়েছিল তাঁর নামে চিহ্নিত ।

প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসে এইসব ঝিনুক, শাঁখ, কড়িজাতীয় প্রাণীগুলির আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের অনেক আগে। কিন্তু নিজের অধিকার স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ বেপরোয়াভাবে হাত বাড়াচ্ছে এদের জগতে। ঝকঝকে আর বিরল প্রজাতির নমুনা সংগ্রহের আশায় প্রবল জল তোলপাড় করে ফেলছে ডুবুরিরা। জীবন্ত সব নমুনা তুলে আনছে তারা। এইসব নমুনার বাইরের শক্ত আবরণটি হয় নিটোল, নিখুঁত। ভিতরের প্রাণীটিকে মেরে ফেলে চড়া দামে সংগ্রাহকদের কাছে সেইসব শাঁখ ঝিনুক বিক্রী করছে ব্যবসায়ীরা। কি ভীষণ চিন্তাহীনতা আর আগ্রাসন বল তো ? বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে এ এক নিরন্তর আঘাত। ভাবলে মন খারাপ লাগে বড়। কি করা যায় বল তো ?

আজ আর অন্য কোন চিন্তা নয়। ভাল থেক।

নীল

On Tuesday, August 16, 2016 (tbose@ yahoo. com) wrote

Dear Neel,

Why didn't you call me even once ? Do you have any idea how worried I am for you ? You are not answering my call either. Hope you are safe. Be well.

Tanmay

Tuesday, August 16, 2016

প্রিয় তন্ময়,

বুঝতে পারছি আমার জন্য খুব চিন্তা করছ তুমি। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়োনা। আমি ভাল আছি। তোমাকে ফোন করছি না কেন জান ? ফোন করলে যা দেখছি তার সবটুকু তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছা করত। তোমার মূল্যবান সময়ের কতটা চলে যেত বল তো তাহলে ?

গত দুদিন ধরে প্রকৃতির অকৃপণ দান আর খেয়াল খুশীর খেলায় ডুবেছিলাম। আজ দিনটা একটু অন্যরকম কাটল। গতকাল sea shell museum-এর বিষয়ে লিখেছি তোমাকে। শিল্প সম্বন্ধীয় পাঠ্যবইতে Elements of Art-এর সংজ্ঞায় যা যা থাকে form, shape, texture, pattern, color-এ সবেরই এক অভিনব উদ্‌যাপন দেখলাম সেখানে। আজ গিয়েছিলাম Sarasota শহরে। Captiva Island থেকে গাড়ীতে Sarasata যেতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় লাগে। এই শহর আমার আগের চেনা। ২০০৯ সালে এখানে এসে দিনদশেক আমি ছিলাম। সাদা মিহি বালির সমুদ্রসৈকত ছাড়াও সারাসোটা শহরের একটি বিশেষ আকর্ষণ হল The Ringling। রিংলিং সার্কাস

খ্যাত জন রিংলিং ও তাঁর স্ত্রী মেবল শীতকালে থাকতেন এই সারাসোটায়। ভেনিসিয়ান গথিক শৈলীতে নির্মিত তাঁদের প্রাসাদ CA 'D' ZAN সারাসোটার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। রিংলিং দম্পতির ছেষট্টি একর ভূ-সম্পদের মধ্যে আছে আরও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গা। ১৯১৩ সালে মেবল রিংলিঙের গড়ে তোলা গোলাপ বাগান তার মধ্যে একটি। ২৭,০০০ বর্গফুট জুড়ে আছে এই বাগান। প্রায় ১২০০ রকমের গোলাপ ফোটে সেখানে। এই গোলাপ বাগান ছাড়া আরও যে দুটি দ্রষ্টব্য জায়গার নাম না করলেই নয় তা হল museum of art আর circus museum।

এই circus museum টি ভারী মজার লেগেছে আমার। এ যেন অন্য এক জগৎ ! এটিই আমেরিকার

ঐতিহ্যময় সার্কাসের ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটানোর জন্য গড়ে তোলা প্রথম সংগ্রহশালা । ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ছিল রিংলিং ভাইদের সার্কাসের রমরমা । তাদের সার্কাস কোম্পানীতে ছিল ১৩০০ জন কর্মী আর ৮০০টি জীবজন্তু । লোকলস্কর, জীবজন্তু, তাঁবু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সার্কাসের ট্রেন এক একদিনে ১৫০০ মাইল পার হত । ১৫০টি শহরে ঘুরে ঘুরে তাঁবু পড়ত সার্কাসের । তখনের শহরবাসীদের সাদামাটা জীবনে, সেটাই ছিল একটা বিশেষ উত্তেজনার কারণ । সার্কাসের রান্নাঘরে প্রাতঃরাশে রান্না হত ২২৬ ডজন ডিম । সন্ধ্যেবেলা শুরু হত সার্কাসের প্রদর্শনী । একসঙ্গে ৮০০ জন শিল্পী খেলা দেখাত দর্শকদের । বড় তাঁবুর নীচে ১৩০০০ লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখত সেই খেলা । ভুলে যেত দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম । সার্কাসের একটি পুরো দিন – ভোরবেলা শহরে ট্রেন ঢোকা থেকে শুরু করে রাত্রে তাঁবু গোটান পর্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট মাটির পুতুল দিয়ে ধরা আছে এই museum এ । সে এক আশ্চর্য হয়ে দেখার জিনিস ! মিনিয়েচার মাটির মডেল দিয়ে তুলা ধরা সার্কাস জীবন – তাঁবুর ভিতরে সার্কাস শিল্পীদের দিনযাপন, তাদের অবসর বিনোদন, প্রস্তুতি, সাজগোজের পালা, নানা ভেল্কি । শিল্পীর তারিফ করতে হয় প্রতি মুহূর্তে ।

এছাড়াও এখানে রাখা আছে পুরনো ব্যানার, সার্কাসশিল্পী কস্টিউম, একটি ওয়াগন ইত্যাদি । সন্ধ্যেবেলা 'সিয়েস্তা-কি' বীচে সূর্যাস্ত । আজ আবার অন্যরকম খেলা মেঘের সঙ্গে জলের । রঙ বদলের পালা আজ । কিন্তু মুগ্ধতা কাটে না । আশাও মেটে না দেখে দেখে । ভাল থেক ।

নীল

Wednesday, August 17, 2016

প্রিয় তন্ময়,

আজ সকালের সমুদ্রস্নানে গেলাম । এবারের ছুটিতে এই প্রথমবার । স্ফটিকস্বচ্ছ জল । অল্প কয়েকজন ছুটি কাটাতে আসা মানুষ জড় হয়েছে সমুদ্রতীরে । তাদের কথাবার্ত্তা, ইতস্তত আসা যাওয়া, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের হলুদ, গোলাপী ঝিনুক দেখে উচ্ছাস সমুদ্রতীরের পরিবেশটাকে করে তুলেছিল অন্যরকম । মনে হচ্ছিল আজ সত্যিই আলো আর আহ্লাদের দিন ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে রিসর্টের ব্যালকনিতে বসেছিলাম । নীচে ঘন জঙ্গল । লোণা মাটির গাছ সব । জঙ্গল যেখানে শেষ সেখানে শুধু বালি আর বালি । বালির তটরেখা ঘিরে সাগরের জল । গাছপালার সবুজ এত ঘন যে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন সবুজ মেঘ জমাট বেঁধে আছে । আকাশেও ঘনিয়ে এসেছিল মেঘ । সেই মেঘের ছায়ায় গাছপালার গভীরে সবুজ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল নিবিড়, রহস্যময় । সাগরের জলেও তখন কালো মেঘের ছায়া । তারপর একসময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল । আকাশ ভাঙা জল সাগরের অতল জলরাশির বুকে মিলেমিশে একাকার ।

Thursday, August 18, 2016

প্রিয় তন্ময়,

এত চুপচাপ কেন ? ফোন নেই, e-mail নেই, ভাল আছ তো ? রাগ হয়েছে বুঝি e-mail-এর উত্তর দিই নি বলে ? আচ্ছা বেশ । থাক তুমি রাগ করে । আমি তোমাকে জল বালির গল্প শোনাই ।

আজও sunset beach-এ সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিলাম । আমাদের resort থেকে সেখানে যেতে দশ মিনিট মতো লাগে গাড়ীতে । রাস্তাটি ভারী সুন্দর । নানারকম গাছপালা রাস্তার দুধারে । তার মধ্যে কিছু গাছ আমার শৈশবের পরিচিত – গোলঞ্চ, করবী, টগর, নানারঙের জবা । এছাড়াও আরও নানারকম গাছ । আর মাঝে মাঝে সেই সবুজের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সুদৃশ্য সব বাড়ী । তার মধ্যে একটি বাড়ীর নাম Artist's Point । যাতায়াতের পথে বাড়ীটির দিকে চোখ পড়লে মনে হত শিল্পীদের থাকার উপযুক্ত বাড়ীই বটে এটি । বাড়ীর যে

কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে অপূর্ব নৈসর্গিক চিত্র।

ঘড়ির সময় ধরা হিসেব অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় হল ৮টা বেজে তিন মিনিট; পৌনে আটটা পর্যন্ত আকাশ একরকম মেঘেই ঢাকা ছিল। হঠাৎ সেই মেঘের জাল ছিঁড়ে আগুনের গোলার মতো বেরিয়ে এলেন সূর্যদেব। মেঘে মেঘে যেন আগুন ধরে গেল, জান ! আকাশ জুড়ে আগ্নেয়গিরি। সে আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়ল সাগরের বুকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে। ঠিক একই সময়ে ভূ-গোলকের অন্য গোলার্ধে রাঙা উষার আলো ফুটে উঠবে দিগন্তে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের এই খেলা চিরন্তন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই সাগরবেলায় এক সূর্যাস্ত থেকে অন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অধীর প্রতীক্ষা। চেনা মুহূর্তকে নতুন করে পাওয়া প্রতিদিন।

সূর্যদেব অস্ত গেছেন। কিন্তু পশ্চিম আকাশে তখন লেগে আছে আগুনরঙা আলো। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখি তাল, নারকেল গাছের সারির মাথায় মস্ত এক চাঁদ। দিনের আলোয় এমন স্পষ্ট করে এত বড় চাঁদ আগে দেখি নি। মনে পড়ে গেল আজ রাখী পূর্ণিমা। এই মুহূর্তে আকাশে চাঁদ আর সূর্যের সহাবস্থান যেন এক নিবিড় মৈত্রী, প্রেম আর শান্তির দ্যোতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই মিলেমিশে গলাগলি করে থাকার মধ্যে হিংসা ফণা তোলে কি করে বল তো ? কিসের বিরোধ এত মানুষে মানুষে ? কি অধিকারের নেশায় এই হিংসার পাগলামি ?

এপ্রিল থেকে অক্টোবর – এই ছ-মাস রাত নটার পরে গোটা দ্বীপ অন্ধকার। সমুদ্রতীর একেবারে শুনশান্। কেন জান ? এই মাসগুলো নানা প্রজাতির sea turtle-এর breeding season। ডিম ফুটে বের হওয়া বাচ্চা sea turtle রাতের আলোয় পথ চিনে নিজেদের ঘরে ফেরে। তাদের ঘর হল সমুদ্র। বালুতট থেকে সমুদ্র – পথে নানা বিপদ ওৎ পেতে থাকে এমনিতেই। মানুষের কার্যকলাপ যাতে তাদের বিভ্রান্ত না করে তাইজন্য এই সতর্কতা। পূর্ণিমার রাত এইসব সদ্যোজাত sea turtle-দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে। তাই রাতের অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসতে যখন রিসোর্টে ফিরে এলাম চারপাশ নিস্তব্ধ। আকাশে বিশাল এক চাঁদ !

নীল

On Friday, August 19, tbose@yahoo.com wrote

Dearest Neel,

The moon was gorgeous last night. Did you see it ? Of course you did. It must have looked spectacular with the setting of the ocean and the beach. I already figured out that you were not going to reply my e-mail or answer my phone call while you were in Florida. That's alright. I shall wait. I know you are surrounded by your elements. Be happy. Enjoy. I look forward to seeing you as soon as you come back.

Love

Tanmoy
Friday, August 19

তন্ময়,

গতকাল যেখানে লেখা শেষ করেছি আজ ঠিক সেইখান থেকে শুরু করব। এবারের ছুটিতে আজই প্রথম ভোরবেলা হাঁটতে বেরলাম। ভোর আমার বড় প্রিয় সময়। রাত শেষ, আর একটা নতুন দিনের শুরু। আরও একবার নতুন করে প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার সুযোগ। ঘড়িতে তখন সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এখন আর আকাশে রঙের খেলা নেই। শুধু অসীম কালোর মধ্যে সাদা রেখায় আঁকা ঢেউ। সেই ঢেউ-এর ওঠাপড়া ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দিশা বদল করলাম। জ্যোৎস্না মাখা এই বালুচরে এই মুহূর্তেই হয়ত ডিম ফুটে সদ্য বের হওয়া কোন turtle সমুদ্রে ফিরছে। আমার উপস্থিতি তাকে দিগভ্রান্ত করতে পারে ভেবে সমুদ্রকে পিছনে রেখে হাঁটতে শুরু করলাম। রাতের অন্ধকার তখনও ঘিরে রেখেছে চারপাশ। খানিকটা পরে বাঁ হাতি একটা Pier চোখে পড়ল। সেটির দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয়। খোলা সমুদ্রের ঢেউ এড়িয়ে জল এখানে শান্ত। এদিকের এই জলরাশির নাম Pine Sound কোন ভাবনা চিন্তা না করে Pier এর মধ্যে বসে পড়লাম।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ তখনও উজ্জ্বল। রাতের অন্ধকারে মোহময় আলোর জাল বিছিয়ে সে যেন এক যাদুকরী। শান্ত জল ছলাৎ ছলাৎ করে ফিরে আসছে মাটির কোলে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ পূব

আকাশে গোলাপী রঙ ধরল । সন্ধ্যেবেলার মতো আগুনের রঙ নয় । দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল লালচে গোলাপী আভা । অন্ধকারের চাদর সরে গেল জল আকাশ আর মাটির বুক থেকে । জলের উপর উদয় হল সে দিনের সূর্য – উজ্জ্বল লাল, জবাকুসুম ।

সূর্যোদয় দেখে ফেরার রাস্তা ধরলাম । এবারে সমুদ্রের তীর বরাবর চলা । ভোরের প্রশান্তি সেখানেও । মানুষজনের ভিড় নেই বললেই চলে । পায়ের তলায় ঝিনুককুচি, বালি আর ঠান্ডা জলের ছোঁয়া । ঢেউয়ের সঙ্গে একরাশ ঝিনুকের আসা যাওয়া এখন । নিস্তব্দ সমুদ্রতীরে রিনরিনে আওয়াজ হচ্ছে তার । অগভীর জলে মাছ ধরছে দু একজন । এই দ্বীপকে ঘিরে থাকা জলরাশিতে মাছ প্রচুর । American Bottlenose Dolfin, সমুদ্রের ধারে কিছুটা সময় কাটালেই যাদের দেখতে পাওয়া যায় । তাদের এক একজনই একদিনে খায় কুড়ি থেকে ত্রিশ পাউন্ড মাছ ।

সমুদ্রের তীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নানারকম ঝিনুক । বড় বড় ঝিনুকের বুকে টলটল করছে লোনা জল । বাহারী ঝিনুক খুঁজে পেতে একটু মনোযোগ দিতে হয় । নান্দনিক কারণে তাদের চাহিদা বেশী । তাই ঢেউয়ে ভেসে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসাহী পর্যটক কুড়িয়ে নেয় তাদের । কিন্তু বাহার যাদের কম বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের ভূমিকা কোন অংশে গৌণ নয় । জল আর বায়ুর ক্ষয়কার্যের প্রভাবে এইসব শামুক, ঝিনুক, শাঁখ বালিতে পরিণত হয় । তার ফলে অটুট থাকে সমুদ্রতীর বর্ত্তী উপকুল । আমিও মনের আনন্দে ঝিনুক কুড়োলাম কিছু । গোলাপী, কমলা, হলুদ – নানারকম । ফিরে গিয়ে তার কয়েকটা দেব তোমায় । হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল চকচকে বাদামী রঙের ভারী সুঠাম প্রায় ৫'' লম্বা একটি শাঁখ । কুড়িয়ে নিয়েই বুঝতে পারলাম সেটি জীবিত । দোকানের তাকে রাখা শাঁখগুলির আবর্ত্ত যেখানে শেষ হয়েছে সেই অংশটুকু ফাঁকা, এ তো দেখতেই পাও । জীবিত শাঁখের বেলায় সেখানে থাকে একটা কালো পর্দা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলে operculum ভিতরের প্রাণীটি জীবিত থাকলে সেই operculum শক্ত করে বন্ধ থাকে । হাতে ধরে না দেখলে বোঝার উপায়টি নেই । আমি যেখান থেকে শাঁখটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেখানেই আবার তাকে যত্ন করে রেখেদিলাম । আমার বসার ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য ভিতরের প্রাণটিকে নষ্ট করে কি লাভ হত বল ? আকাশ মাটি, জল বালির এই যে শোভা সে তো প্রাণ আছে বলেই ।

আর কিছুদুর এগোতেই এইসব দার্শনিক চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল । জলচর পাখীদের সভা বসেছে ভীষণরকম শোরগোল তুলে । তাদের মধ্যে দুরকম পাখী চিনতে পারলাম – এগরেট আর হিরণ । দুটো পেলিকান ভেসে বেড়াচ্ছে কিছুটা দূরে । সভাসমিতির যোগ দেওয়ার তাদের কোনরূপ আগ্রহ দেখা গেল না ।

আজ শুধু সকালবেলাটুকুর কথা কেমন ?

সারাদিনের বাকী কথা লিখতে ইচ্ছা করছে না । ভাবছি তোমার কথা । জানি তুমিও ভাবছ আমাকে । ভাল থেক ।

নীল

Saturday, August 20, 2016

তন্ময়,

আমার ছুটি শেষ । আজ ফিরে যাওয়ার পালা । গতকাল বিকেলে wild life watch cruise এ গিয়েছিলাম । সমুদ্রের বেশ গভীর পর্যন্ত যাওয়া হল । সেখানে আকাশ আরও উদার । জলের বিস্তার অপার । তরঙ্গ আছে সেখানেও । জলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অনন্ত গভীরতার উপলব্ধি হয় ।

এই দ্বীপটির ইতিহাস, প্রকৃতি, এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সবকিছু সমুদ্রকে ঘিরে ।

এই দ্বীপের উত্তরে আছে আরও একটি দ্বীপ । তার নাম নর্থ ক্যাপটিভা । একসময় নর্থ ক্যাপটিভার আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না । ১৯২১ সালে হারিকেন চার্লি ক্যাপটিভা দ্বীপটি ভেঙে দুটুকরো করে দিয়েছে । দুটুকরো ভূখন্ডের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা জলরাশির নাম 'রেড ফিস পাশ' । জলের স্রোত খুব জোরাল সেখানে । নাম থেকেই বুঝতে পারছ অসংখ্য রেড ফিস ঘোরাফেরা করে সেই জলে । ডলফিনের আনাগোনাও সেখানে তাই বেশী ।

নৌকা চলছে । হঠাৎ দেখা গেল সবুজ নীল জলের তলা দিয়ে কালো চলমান কতগুলো ছায়ামূর্তি তীরবেগে আমাদের নৌকোর পাশ দিয়ে চলেছে । তার পরক্ষণেই কিছুটা দূরে কখনও পুরো শরীরটা শূন্যে তুলে দক্ষ ডাইভারদের মতো নীল জলে লাফিয়ে পড়তে থাকল দুটি

ডলফিন। নৌকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ক্যামেরা হাতে উদভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে পর্যটকরা।

বটলনোজ ডলফিনরা সাধারণত পরপর দু তিনটি লাফ মারতে ভালবাসে। তাই একবারে না পারলেও অনেকেই চেষ্টাচরিত্র করে এক দুটি ডলফিনকে শূণ্যে লাফিয়ে ওঠা অবস্থায় ক্যামেরা বন্দী করতে পেরেছেন।

শূন্যে তখন অন্য খেলাও চলেছে। তার খেলুড়িরা হল সামুদ্রিক সব পাখিরা সমুদ্রের মাঝে মাঝে যেখানে গভীরতা নির্ধারক খুঁটি পোঁতা আছে। তার উপর থেকে থেকেই এসে বসছে অসপ্রে। ঠোঁটে মাছ। নৌকার এক কর্ত্তা একটি মজার গল্প শোনালেন। একবার নাকি এক করমোর‍্যান্ট ঠোঁটে মাছ নিয়ে উড়ছিল। হঠাৎই তার সামনে চলে আসে এক 'বল্ড ইগ্‌ল'। অপ্রত্যাশিত আততায়ীকে দেখে করমোর‍্যান্টের ঠোঁট থেকে মাছ খসে পড়ে। সে মাছ জলে পড়ার আগে শূন্যেই তাকে গিলে ফেলে বল্ড ঈগলটি।

জলচর পাখী আর প্রাণীদের নিয়েই এই দ্বীপের জীবনের নাটক। গতকালের সূর্যাস্ত ছিল একেবারে অন্যরকম। পশ্চিম দিগন্তে গাঢ় লাল কমলার ঘনঘটা নয়, সারা আকাশ জুড়ে এক অদ্ভুত নরম আলো ছড়িয়ে পড়ল সূর্য ডোবার আগে। খোলা সমুদ্রের হাওয়ার সঙ্গে মিশে সে আলো এক মায়াময় পরিবেশ তৈরী করে দিল। মনে হচ্ছিল আলো, হাওয়া, জল, আকাশ, মাছ, পাখী – সব মিলেমিশেই সম্পূর্ণ এই দ্বীপের প্রকৃতি, জীবন। কোন একটা কিছু এর থেকে সরিয়ে নিলেই সুর কেটে যাবে। সেই মুহূর্তে নৌকার খোলা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে মনে আসছিল রবীন্দ্রনাথের গানের চরণ –

''এই বিশ্ব মহোৎসব / দেখি মগন হল / সুখে কবিচিত্ত / ভুলি গেল সব কাজ, দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মান্ড মাঝে''

তুমি তো জান আমি মুহূর্তকে ক্যামেরা বন্দী করতে ভালবাসি না। পারিও না ঠিক। তাই শব্দ দিয়ে কিছুটা ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম এই Captiva island-এর। ভাল থেকো। ফিরে গিয়ে কথা হবে।

নীল

গল্প

মৃগদেব

ইন্দ্রাণী দত্ত, সিডনি, অসট্রেলিয়া

সুখ বলতে সুপর্ণার চোখে একটা ছবি ভাসত – সে ছবির কতখানি সত্য কতখানি মনগড়া না কি পুরোটাই স্বপ্ন – সুপর্ণা জানে না। সুখ ভাবলে কোথাও যেন কিরকির শব্দ করে প্রজেক্টর চালু হয়ে যেত আর সুপর্ণা একটা সাদা কালো ভিডিও ক্লিপ দেখতে পেত – চোখের একদম সামনে; দেখত একটা চওড়া রাস্তা – নতুন সব ঘরদোর তৈরি হচ্ছে একদিকে – পাঁজা পাঁজা ইঁট, সিমেন্ট, বালি, স্টোনিপসের ঢিপি, ভারা বেঁধে কাজ, অন্যদিকে অজস্র কাশফুল আর মহালয়ার আগের দিন বেলা দশটা নাগাদ মা বাবা আর সুপর্ণা রিকশা করে যাচ্ছে। সে ছবিতে রোদ চড়া নয় – নীল আকাশ; আর সেই আকাশের নিচে পিচঢালা নতুন রাস্তা ধরে যেন এক গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন যাচ্ছে সুপর্ণা, যেন ফিরবে সন্ধ্যায়, যেন বিকেলে আর পড়াশোনা নেই তার। তারপর যেন শেষরাতে মহালয়া শুনবে, আর তার পরদিন রবিবার। সোমবারে যেন কোনো ক্লাস টেস্ট নেই বরং পুজোর ছুটি পড়ে যাবে দুপুরে। এব্যতীত গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নের মেনুতে ফিসফ্রাই একথাও যেন জানা গেছে আগেই। একটার পর একটা সুখবোধ, আনন্দ, ভালো লাগা যেন মুক্তোর মালার মত পরপর গাঁথা – যেন কোথাও কোনো ফাঁক নেই, যেন বিষাদ কিংবা দুঃখ ঢোকার কোনো পথই খোলা নেই। ঘটমান বর্তমান আর অপুর ভবিষ্যত মিলিয়ে সেই ভিডিও ক্লিপকেই সুপর্ণা সুখ বলে জেনেছে এতকাল। সেই মালার মত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পেতে হ'লে দাম ধরে দিতে হয় – এই কথাটা অবশ্য সুপর্ণা ধীরে ধীরে জেনেছে। কোনো কোনো রাতে ব্যালকনিতে বসে থাকতে থাকতে করোগেটেড ফাইবারের শেডের ভেতর দিয়ে চাঁদের মালা দেখত সুপর্ণা। অখণ্ড ও একটানা। এই দেখার পিছনে কোনো এক শারীরবৃত্তীয় বা নিছক ভৌত কারণ আছে যেটা সুপর্ণা জানত না অথচ এই চাঁদের মালা যে চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলবে না এই রকম তার মনে হ'ত। এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন সুখবোধে সে মজতে থাকে, সেইমত নিজেকে ট্রেইন করে তারপর অভ্যস্ত হয়ে যায়। অখণ্ড সুখবোধের মূল্য সে চুকিয়ে আসছে আজ চল্লিশ বছর। কারোর কোনো কথায় কোনোদিন না বলেনি সুপর্ণা।

এই যেমন আজ এই রিসর্টে সে আর অতনু বিয়ের কুড়ি বছর উদযাপন করতে এসেছে, সেও অতনুর ইচ্ছায়, অতনুর পছন্দে। কোথায় যাবে, হোটেলে থাকবে না রিসর্টে না সরকারী ট্যুরিস্ট লজে, কি খাবে সবই অতনুর ছকে দেওয়া। অখণ্ড সুখবোধের চাঁদমালা সুপর্ণার হস্তধৃত এতদিনে, সে তা হাতছাড়া করতে চায় নি, বলাই বাহুল্য। অতনুর সঙ্গে ওর বিয়েটাও এভাবেই। মায়ের প্রতিটি কথায় সে হ্যাঁ বলেছিল – পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, পাত্রপক্ষের মেয়ে দেখতে আসায়, অতনুকে কেমন লাগল প্রশ্নের উত্তরে সে হ্যাঁ বলেছে, ঘাড় কাত করে মাথা নেড়েছে। রোম্যান্সের সামান্য একটা সুতো ছিল অবশ্য – যেদিন অতনু ওকে দেখতে আসে সেই আশ্বিনের সকালে আকাশবাণী কলকাতা 'ক'র সাতটা চল্লিশে 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে' বেজেছিল, সন্ধ্যায় অতনু সহ পাত্রপক্ষ সুপর্ণাদের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ফোন এলে, ফোনের ওধারের হবু জা, ফোনের এধারের বাবা, মা, জেঠু জেঠিমা সুপর্ণার উত্তরের প্রত্যাশী হয়। সুপর্ণার কানে শরতে আজ কোন অতিথি বাজতে থাকে এবং সে এক সেকেন্ডের কম সময়ে হ্যাঁ বলে। এ বিষয়ে গিনেস রেকর্ড বুকে কোনো রেকর্ড আছে কি না জানা ছিল না কারোরই, তবু সুপর্ণার মা অবাক হয়ে বলতে থাকে – 'আরেকটু সময় নিয়ে ভাবতে পারতি,' বাবা বলেছিল, 'স্বচ্ছন্দে না বলতেই পারিস'। এখন 'না' বললে, আবার কবে এই রকম পরিস্থিতি আসবে এবং আজকের আর সেই ভবিষ্যত পরিস্থিতির মাঝে ফারাক কতদিনের এবং সর্বোপরি সেই ফারাকে অখণ্ড সুখবোধের মডেলটি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কি না সে বিষয়ে কোনো অদৃশ্য অঙ্ক কষা সুপর্ণার মনে চলতে থাকে এবং ফলশ্রুতি 'হ্যাঁ তে দাঁড়ায়।

এই সব ছিল পুরোনো কথা। আজ ওরা অন্য শহরে। এই শহরে সবাই হরিণ দেখতে আসে। রিসর্টের ঘরে ঘরে বিছানার চাদরে হরিণের মোটিফ, বিলবোর্ডে হরিণের ছবি, বাজারে হরিণ আঁকা টি শার্ট, হরিণের সফট টয়, রাস্তায় তীরচিহ্ন দিয়ে, একাধিক ভাষায় 'ডিয়ার পার্ক এই দিকে'

লেখা। আজ সকালে রিসর্টে পৌঁছনোর পরেই অতনু দরজা বন্ধ করেছে, দুপুরে 'চলো তোমাকে এখানকার ফেমাস বিরিয়ানি খাওয়াই' বলেছে – এসবই সুপর্ণার হস্তধৃত সুখের মালায় একদম খাপে খাপে ফিট করে গেছে। রোদ পড়লে বিকেলে ওরা ডিয়ার পার্কে হরিণ দেখতে যাবে – এরকমই কথা হয়ে আছে। সুপর্ণা অতনুর পাশে শুয়ে, বালিশে মাথা, এ সি মেশিনের মৃদু আওয়াজ আসছে, ভারী পর্দার বাইরে দুপুরের রোদ, পাশের ঘরে বড় গোছের একটা গ্রুপ সদ্য চেক ইন করল। হাল্কা কথা শোনা যাচ্ছে করিডোরে, একটা বাচ্চা একটানা গাইছে, হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং। এক কথায়, ঘটমান বর্তমান বা অদূর ভবিষ্যতে কোনো বেদনাবোধের স্থান নেই।

ওদের রিসর্ট থেকে ডিয়ার পার্ক মিনিট পঁয়তাল্লিশ, সূর্য ডোবার সময়ে হরিণরা দল বেঁধে জল খেতে আসে। ট্যুরিস্টরা সানসেট, জলস্রোত আর হরিণের পালকে এক ফ্রেমে ধরে নিয়ে বাড়ি যায়। বেরোনোর আগে অতনু ক্যামেরার ব্যাটারি চেক করল। রিসর্টের বাসে করল। রিসর্টের বাসে আরো দুটি দল, সানগ্লাস, টুপি, জলের বোতল। বাচ্চা ছেলেটা একই গান গেয়ে চলেছে – হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং। হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং।

যদিও বিকেল, রোদ এখনও চড়া, উল্টো দিক থেকে হু হু ট্রাক, বাস, অ্যাম্বাসাডর, মারুতি, দুপাশে ধানক্ষেত, কাশের গোছা, রাস্তায় কোথাও ধান শুকোতে দেওয়া আছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে অতনু যাত্রাপথের টানা ভিডিও তুলছে, পরে এডিট ক'রে ফেসবুকে আপলোড করে দেবে। দাবাং দাবাং-এর দল আর অন্য দলটি সূর্যাস্তের সময়ে জলের কাছে পৌঁছোনো নিয়ে সামান্য চিন্তিত। বাসের ড্রাইভার 'বালম পিচকারি' চালিয়ে দিয়েছে। এই সময়, সামনে রাস্তার ওপরে একটা ভীড় দেখতে পেলো সুপর্ণা। অতনুও দেখেছে। ড্রাইভার গান বন্ধ করে বাসের গতি কমালো। যে ভীড়টা দূর থেকে ছোটো মনে হচ্ছিল, কাছ থেকে তাকে আর ছোটো লাগছিল না সুপর্ণার। উপরন্তু রাস্তার এদিকের ধানক্ষেত, ওদিকের ইঁটভাটা পেরিয়ে আরো কিছু মানুষ রাস্তায় এসে উঠতে লাগল। কিছু লোকের হাতে বাঁশ লাঠি আর টাঙ্গি দেখল সুপর্ণা। ভীড়ের মধ্যে থেকে দুজন হাতে গামছা নাড়তে নাড়তে বাসের দিকে এগিয়ে এলে, ড্রাইভার বাস থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাবাং-এর দল চেঁচিয়ে বলল, 'কেউ নামবেন না বাস থেকে, প্লীজ, প্লীজ'; অতনু 'কি হ'ল' বলতে না বলতেই, বাসের গায়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কেউ বলল, 'এই রাস্তা বন্ধ, বলছি না ব্যাক করতে'। ড্রাইভারের পাশের জানলার কাচ নামানো ছিল, সেখানে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে কেউ বলল – 'বলছি না, ব্যাক করতে। কানে কথা যায় না ?' অতনু মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে ভাই' ? ঐ ভীড়কে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করতে পারছিল সুপর্ণা – একটা দল যাদের হাতে লাঠি, বাঁশ, অন্য ভাগটা স্রেফ দর্শক। অতনুর দিকের ভীড়টা মূলতঃ দর্শকের। সেখান থেকেই কেউ বলল – 'মোষ চুরির ধোলাই চলতেসে।' সুপর্ণা এই বার দেখতে পায় ভীড়ের ভেতরে আরেকটা ছোটো ভীড়, সেই ছোটো ভীড়ের ভেতরে আরেকটা ছোটো ভীড়, সেই ছোটো ভীড়ের মাঝখানে কেউ শুয়ে – বিকেলের রোদে শুধু শুষ্ক দুটি পায়ের পাতা; লাঠি হাতে লোকদুটি বাসের জানলা ছেড়ে আবার ভীড়ের দিকে দৌড়ে যায়।

অতনু কপাল মুছে বলে, 'যত্তো সব ঝামেলা, ব্যাক করে ডানদিকের মাটির রাস্তায় চলো, ওখানে থেকে হাইওয়ে ধরলে এখনও সানসেট দেখা যাবে।'

বাকি পথ একদম ঝামেলা রহিত ছিল। শেষ বিকেলে ওরা জলের কাছে, হরিণের কাছে, সূর্যাস্তের কাছে ঠিকই পৌঁছতে পেরেছিল, ছবি উঠেছিল অনেক, সেল্ফিও। সে রাতে রিসর্টের ডাইনিং হলের ৩৯ ইঞ্চি স্ক্রীনে সংবাদপাঠক মোষ চোর সন্দেহে এক কলেজ ছাত্র হত্যার খবর দেয়; জানা যায় দুষ্কৃতীরা অসনাক্ত – পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। বুমের সামনে শীর্ণা বৃদ্ধাকে বিলাপ করতে দেখে সুপর্ণা, একটি কিশোরীকেও। মৃত ছাত্রর মা আর বোন যথাক্রমে। সুপর্ণার হস্তধৃত মালাটির জপ বন্ধ হয়ে যায় এই খানে।

সুপর্ণা জিগ্যেস করে – 'তোমার ক্যামেরা অন ছিল না অতনু ? ছবি ওঠে নি একজনেরও ?'

– 'তো ?'

– 'লোকাল থানায় গেলে হয় না ?'

– 'পাগল না কি তুমি ? এই সব ঝামেলায় যেচে যায় কেউ ? তার ওপর শিওর পোলিটিকাল পার্টি ইনভলবড। তিন আঠারোয় পুরো চুয়ান্ন ঘা হয়ে যাবে। দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে এই সব কেউ করে ?'

সুপর্ণা খিদে নেই বলে উঠে যায়। অতনুও ওঠে।

– 'মাথা ধরেছে তোমার ? একটা স্যারিডন খেয়ে শুয়ে থাকো বরং। কাল ভোরে উঠতে হবে। গাড়ি বলা আছে।'

সমস্ত রাত গুম মেরে থাকে সুপর্ণা। বারে বারে জল খায়, বাথরুমে যেতে থাকে। ভারি পর্দার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের বাগানের আলোর একফালি ওদের বিছানায়, অতনু ঘুমোচ্ছে। আলো জ্বালিয়ে ক্যামেরা খোঁজা সম্ভব নয়, জেগে যাবে। অন্ধকারে সুপর্ণা ভাবতে থাকে, 'ক্যামেরা কোথায় রেখেছে অতনু' ?

পর্দার যে ফাঁক দিয়ে বাগানের আলো ঢুকছিল রাতে, সেই ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকলে, অতনুর দিকের সাইড টেবিলে ওর ক্যামেরা দেখতে পায় সুপর্ণা। এই সময় অতনু ঘুম ভেঙে সুপর্ণার চোখের দিকে তাকায় তারপর ক্যামেরার দিকে।

– 'কি ভাবছটা কি ? এই সব কি পাগলামি ? কি হয়েছে কে তোমার ?'

– ক্যামেরাটা নিয়ে থানায় চলো অতনু, প্লীজ।'

– 'ও ভিডিও এক্ষুনি ডিলিট করে দেব – পুলিশকে দেখানোর কিছু থাকবে না।'

এক লাফে বিছানা ছেড়ে ওঠে অতনু। পর্দা সরিয়ে, চোখ কুঁচকে ক্যামেরা অন করে।

পর্দা সরাতেই সূর্যের আলো হু হু করে ঢুকতে থাকে, বিছানায় থৈ থৈ করে রোদ, চাদরে হরিণের মোটিফে আলো – সবুজ ঘাস পরিস্ফুট হয় প্রথমে তারপর হরিণেরা জাগে। জেগে ওঠে, জ্যান্ত হয়, মাথা তুলে সুপর্ণার দিকে তাকায়। সেই চাহনিতে সুপর্ণার হস্তধৃত এতকালের সুখমালাটি ছিঁড়ে ঝরঝর করে মুক্তোগুলি মেঝেতে গড়িয়ে যেতে থাকে। ঠিক তখনই মিনিটের ভগ্নাংশ সময়ে, এত বছরের অনুচ্চারিত সমস্ত 'না' গুলিকে সংহত করে বিছানার অন্য প্রান্তে পৌঁছতে সুপর্ণা ভল্ট খায় – যেন দীপা কর্মকারের প্রাদুনোভা ভল্ট – যে ভল্ট না দিলে নতুন করে কিছু শুরু করা যায় না। হতবাক অতনুর হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খোলে সুপর্ণা। উস্কোচুল, লাল চোখ আর রাতপোশাকেই রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে। চল্লিশ বছরের সুপর্ণা স্প্রিন্ট টানে খালি পায়ে। সঙ্গে হরিণগুলি। সুপর্ণা যখন করিডোর দিয়ে দৌড়োচ্ছিল, পাশের ঘর, তার পাশের ঘর থেকে আরো হরিণ বেরিয়ে আসে। নিচের লবি, ডাইনিং হল, রিসেপশন থেকে আরো আরো হরিণ।

কথিত আছে, সন চোদ্দোশো বাইশ বঙ্গাব্দে আশ্বিনের সকালে বড় রাস্তা ধরে এক দল হরিণকে দৌড়তে দেখা গিয়েছিল। যানবাহন রুদ্ধগতি, এবং পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়েছিল। অজস্র টুরিস্ট আর স্থানীয় বাসিন্দা সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল। সেল্ফি তোলার সাহস করে নি কেউই। তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া সমস্ত হরিণের চোখ রক্তবর্ণ, গ্রীবাভঙ্গী গর্বিত, এবং উন্নত ছিল।

সন চোদ্দোশো বাইশের আশ্বিনের সকালে হরিণের বন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

গল্প

সতী

দেবীপ্রিয়া রায়, ফ্লোসমোরী, ইলিনয়

শাশ্বতী আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল একটা; পা দুটো গুটিয়ে আধশোয়া হল খানিক। সাকেত হাত বাড়িয়ে খালি ড্রিংকের গেলাসটা সামনের টেবিলে রাখছিল। শাশ্বতীর হাবভাব একনজর দেখে বলল, 'আরে, মোহিত ভাই, আপনার বিবির হালত খারাপ, জেট ল্যাগ ধরেছে। এবার বোধহয় আপনাদের বেডরুমটা দেখিয়ে দিতে হবে। বাকি গল্প কালকের জন্য তুলে রাখা যাক্। এই বীণা-বন্ধুদের সব ব্যবস্থা রেডি ?' শাশ্বতী লজ্জা পেয়ে উঠে বসল, 'না না এখনি ঘুমোবো না। আসলে পরশু দিল্লিতে প্লেন থেকে নেমেই ওর কানপুর আই আই টি র এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ী উঠেছিলাম। সেখানেও ক্রমাগত গল্প আর আড্ডায় সময় কাটিয়েছি। বয়েস তো হল। ঝট্ করে ক্লান্ত হয়ে যাই। তাই বলে এখনি ঘুমোনোর কোন প্ল্যান আমার নেই। এত দিন পরে বীণার সাথে দেখা হল, কত গল্প বাকী এখনো !' বীণা উঠে গিয়ে গেলাসগুলো কিচেনে রেখে আসছিল। যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বল্ল, 'ঠিক বলেছিস্। ওরা ঘুমাক্ গিয়ে। সাকেতটা চিরকাল ঘুমকাতুরে, তায় পেটে ড্রিংক পড়লে আরো চট্‌পট্ নাক ডাকায়। মোহিত ভাইও হয়তো ক্লান্ত। সব ব্যবস্থা করাই আছে। সাকেত বেডরুম দেখিয়ে দাও ওনাকে, তারপর যাও ঘুমাও গিয়ে। আমরা দুই বন্ধু কতদিন বাদে এইভাবে বসার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের অনেক কথা বলাবলি হবে।' 'আরে ঘুম পেয়েছে তো তোমার বন্ধুর, তোমার তো নয়। কি অত্যাচার করো তুমি বীণা ! সব সময় নিজের মত অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা।' 'দেখো জী, তোমার মত না মানলেই তোমার মনে হয় আমি স্বাধীনচেতা। বেশ তাই যদি হয় তো তাই। আমার বন্ধুর ব্যপার আমি বুঝবো। ঘুম পেয়েছে তো কি ? আমরা সেই কলেজ হোস্টেলের মত দুধ পাত্তি মসালা চায় বানিয়ে ঘুম তাড়াবো। এখন যাও, আমাদের একা থাকতে দাও।' সাকেত কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তার তাকানোর ধরণ দেখে বোঝা গেল, সে গৃহিণীর উত্তরে বিশেষ অসন্তুষ্ট। মোহিত এত কথার মাঝে ন যযৌ ন তস্থৌ মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শাশ্বতীও সোজা হয়ে উঠে বসে চটিতে পা গলাচ্ছিল, এক পা চটিতে দিয়ে সে সেখানেই স্থির ! ঠিক কার কথায় সায় দেওয়াটা উচিৎ হবে দুজনের কেউই বুঝছিল না। এটা সত্যি যে আজ অনেক বছর পর ওরা দুই বন্ধু এইভাবে বসে কথা বলতে পারছে। মাঝের অনেকগুলো বছর ছেলেপুলেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাদের ছোটবেলাটায় একরকম ব্যস্ততার দিন গেছে, তারপরে তারা বড় হয়ে গেলেও নিজেদের আসা যাওয়া ঘোরা বেড়ানোগুলো ছেলেমেয়েদের ইচ্ছাতেই করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য মায়ের কলেজের বন্ধুর বাড়ী গিয়ে থাকাটা আদৌ তাদের সেই ইচ্ছার মধ্যে পড়তো না। এখন বীণার মেয়ে একটা আই টি ফার্মে কাজ করছে ব্যাঙ্গালুরুতে, ছেলে এম বি এ করে মধ্যপ্রদেশে পারিবারিক ব্যবসা সামলাচ্ছে। সে ব্যবসায় ঢোকার আগেই সাকেত আর বীণা নিজেরা দেখেশুনে তার বিয়ে দিয়েছিল। এতদিনে তাদের একটি মিষ্টি নাতি হয়ে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় অনেকটা সময় তার ছবি দেখে কেটেছে। মেয়ে অবশ্য এখনো বিয়ে করেনি। সেই নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। মেয়েকে বেশী পড়ানো আর স্বাধীনতা দেওয়াটা ভুল হয়ে গিয়েছে কিনা সেই ভেবে সাকেত আক্ষেপ করছিল একটু। শাশ্বতী লক্ষ্য করেছিল যে বীণা সেই আক্ষেপে যোগ না দিয়ে চুপ করেছিল। শাশ্বতী নিজেও সাততাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাস করেনা। তার বড় মেয়ে সেই কবে ডাক্তারি পাশ করেছে। কাজ করছে তাও বেশ কিছুদিন হল। এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ডেট করেছে বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত বিয়ে অবধি কোনটাই এগোয়নি। ছোটটিও এইবার গ্র্যাজুয়েট করে লফার্মে ইন্টার্ন হয়েছে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তারও কোন উচ্চবাচ্য নেই। মোহিত আগে আগে এই নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতো, কিন্তু সাবালিকা বুদ্ধিমতী মেয়েদের উপরে জোর খাটানো যায় না। দুটি মেয়েরই যথেষ্ট স্থির বুদ্ধি বলে নাম আছে। তাদের উপর ভরসা করে আজকাল চুপ করেই থাকে সে ইদানীং। সাকেতের কথায় তাই সে কেবল হুঁ হাঁ ছাড়া কথা বলেনি। কিন্তু টের পাওয়া যাচ্ছিল যে কথাবার্ত্তা হাসি গল্প চারজনে মিলে করলেও বীণাদের নিজেদের দুজনের মধ্যে যেন একটা চাপা অসন্তুষ্টি, চাপা বিরোধ লুকিয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক

পরিষ্কার না বোঝা যাওয়ায় শাশ্বতীরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে দুইজনেই চুপ করেছিল।

কর্ত্তারা শুভরাত্রি জানিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে রওয়ানা হলে পর এতক্ষণে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা না করে পারলোনা। 'হ্যাঁরে, তোদের কি আমাদের এসময় আসা নিয়ে কোন অসুবিধা হয়েছে? কিরকম যেন একটা অশান্তির মত লাগছে!' বীণা প্রথমটা চমকে উঠেছিল। প্রশ্নটা বোধহয় আশা করেনি। তারপর ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'এই থিয়োরি করার স্বভাবটা তোর গেলোনা। তোরা আসাতে যে খুশী হয়েছি, সেটা কি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দেখাব?' শাশ্বতী একটু চুপ করে রইল, তার পর বল্ল, 'উহুঁঃ তুই কথা ঘোরাচ্ছিস। না যদি বলিস, আমি কাল সকালেই বরেলি ছেড়ে লখনউ চলে যাব। আমার কেমন ভাল লাগছে না।' বীণা একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গী করে বলল, 'তাহলে তাই যা। যত রাজ্যের নখরা করা চিরকালের স্বভাব তোর। আমি সামলাতে পারব না।' শাশ্বতী চুপ করে গেল। ইস্, কথাটা এভাবে না তোলাই বোধহয় ভাল ছিল। এখন কি বিশ্রী ভাবে ওদের কাছ হতে বিদায় নিতে হবে! মিনিটখানেক পর বলল, 'আচ্ছা, আমার শোবার ঘরটা দেখিয়ে দে। শুয়ে পড়ি।' 'চল্' বলে উঠে দাঁড়াল বীণা, কিন্তু এগুলো না এক পাও। তারপর হঠাৎ শাশ্বতীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'তোকে না বলে ভুল করছি। কারুকে বলা দরকার আমার। বুকের মধ্যে এই কথা আর বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারছি না।' শাশ্বতী হতভম্ব। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল সেও, কিন্তু কি বলবে কিছুই তো বুঝছে না। খানিকক্ষণ গেল। দূরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্‌ঠক্ আর হাঁক আর রাতজাগা কুকুরের ডাক – এছাড়া সব নিস্তব্ধ।

বীণা চোখ মুছে বলল, 'বলব তোকে সব। দাঁড়া আগে দুধপাত্তির চায়টা বানাই।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সে। ফিরে এল, হাতে চায়ের ঢাউস মাগ। বন্ধুর হাতে মাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কি ভাবে শুরু করব, বুঝছি না। তার চেয়ে চট্ করে একবারে বলে ফেলি। সোনল – আমাদের মেয়ে বিয়ে করেছে!' 'সে কি তাহলে যে সাকেত ভাই বল্লেন --?' 'হ্যাঁ, সাকেত মেয়ের উপর রাগ করে ওরকম বলছে। কিন্তু কিসের রাগ বলতে পারছেনা। সোনল যাকে বিয়ে করেছে সে ছেলেটি মাদ্রাজি মুসলমান।' 'অ্যাঁ?' আঁতকে উঠল শাশ্বতী। অন্য অনেক বন্ধুদের মত তার মুসলমান সম্বন্ধে জিঘাংসা আর রাগ নেই, তাদের দেখলেই সে রেগে ক্ষেপে তাদের পাকিস্তানে পাঠানোর জিগিরও তোলে না, কিন্তু বিয়ে? মুসলমানকে বিয়ে? ধর্ম বদলাতে হবে না? প্রথম এই প্রশ্নটাই তার মনে এল, তাই সেইটাই সে জিজ্ঞাসা করে ফেলল। 'সোনলও কি মুসলমান হয়ে গেছে?' 'নাঃ, ওরা সিভিল ম্যারেজ করেছে। ধর্ম পাল্টানোর কথা ওঠেনি।' 'সেটা কি ওর শ্বশুরবাড়ী মেনে নেবে? ওরা তো যতদূর জানি --' 'অত কথা জানিনা। কিন্তু সাকেত নিজেই তো এই বিয়ে মেনে নিতে চাইছেনা। ও চাইছে সোনলের সাথে সব সম্পর্ক তুলে দিতে।' 'স্বাভাবিক' – মন্তব্যটা করতে গিয়েও সামলে নিলো শাশ্বতী। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'আর তুই? তুই কি বলিস্?' 'আমি মা। আমি আমার সন্তানকে ফেলতে পারবো না। সোনল আমার ভাল মেয়ে। শুধু লেখাপড়ায় ভাল নয়। ও আমাকে বোঝে, আমাদের সবাইকে বোঝে। সবার জন্য ওর খেয়াল আর মায়া মমতা। ওকে আমি শুধু ভালবেসে বিয়ে করার অপরাধে কোল থেকে নামিয়ে দেব? কখনো না'। 'কিন্তু সমাজ? ও কোন সমাজে নিজের পরিবার নিয়ে বাস করবে রে? যতদূর জানি সাকেত ভাইয়ের পরিবার গোঁড়া হিন্দু – তুইই বলেছিস। সোনলকে মেনে নিলে ওরা তো তোকেও আর স্বীকার করবে না।' শাশ্বতী বুঝতে পারছিল যে বীণাকে তার জেদ ছাড়তেই হবে, নাহলে ওর নিজের এতদিনের ঘরসংসার সবই সঙ্কটে পড়বে। 'হ্যাঁ, আমার শাশুড়ি বলেই দিয়েছেন যে উনি আর আমার হাতে কখনো খাবেন না।' 'তাহলে? ওনার বিরুদ্ধে গিয়ে তুই কি'? 'শোন শাশ্বতী – গোঁড়া হিন্দুয়ানির তুই কি বুঝিস? তোকে এই রাতের অন্ধকারে একটা কথা বলি – দিনের বেলায় সেটা হয়তো বলে উঠতে পারবো না। সাকেত – যাকে আমার শ্বশুর রামপ্রসাদ গুপ্তার ছেলে বলে সকলে জানে, সে আসলে তাঁর ছেলে নয়। তার আসল বাবা ওর জ্যাঠা রামাশ্রয় গুপ্তা।' ঘরের আলোটা কি নিভে গেল? শাশ্বতীর চোখের সামনে চেনা জগতটা ধোঁয়ার মত লাগছে। সাকেতের মা'কে সে একবার দেখেছে। নিরীহ নিপাট গ্রাম্য মহিলা, পূজা আর্চা নিয়ে থাকেন, হাসি হাসি স্নেহ ভরা মুখ! তাঁর সম্বন্ধে এই রকম কলঙ্ক দিচ্ছে তাঁর ছেলের বৌ? ও কি পাগল হয়ে গেল? 'কি বলছিস তুই। তুই কি পাগল?' 'না – আমি পাগল নই। তবে পাগল হয়েছিলেন আমার শাশুড়ি। বলা ভাল যে তাঁকে পাগল করে দেওয়া হয়েছিল ৫০ বছর আগে। তাঁর স্বামী রামপ্রসাদ ছিলেন সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। বিয়ের অনেক

বছর পর ডাক্তার বদ্যি, তুকতাকের পরে যখন ব্যাপারটা বোঝা গেল, তখন পরিবারে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল । একে তো নির্ব্বংশ হয়ে যেতে হবে, তায় পারিবারিক ব্যবসা দেখার লোকের অভাবে অন্যদের হাতে চলে যেতে পারে । ভয়ে সবাই অস্থির । সেই সময়ে সবার নজর পড়ে রামপ্রসাদের বড় দাদা রামাশ্রয়ের উপর । তিনি ছিলেন বিপত্নীক, প্রথম সন্তান হতে গিয়ে তাঁর বৌটি মারা যায় । সন্তানটিও বাঁচেনি । তারপর থেকে তিনি একটু বাউন্ডুলে গোছের হয়ে যান । কাক পক্ষীকে না জানিয়ে রাতের বেলায় ছোট ভাইয়ের বৌকে এই বড় ভাসুরের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল । আমার শাশুড়ি তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন । এতদিন তিনি বড়ভাসুরের সামনে একগলা ঘোমটা দিতেন । এই ব্যবস্থায় তিনি রাজী হন্‌নি । তাঁকে নাকি চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটাতে পেটাতে মুখ বেঁধে ঢোকাতে হয়েছিল । কপাল দেখ্ – সেই ঢোকানোর পর জন্ম হল এক মেয়ের – আমার বড় ননদ । আবারো সেই পদ্ধতিতে তাঁকে ধরে বেঁধে ভাসুরের ঘরে পাঠানো হল । চিৎকার করে কেঁদেছিলেন, হাতে পায়েও ধরেছিলেন, কিন্তু তিনি রেহাই পাননি । ফল হল – আরেকটি মেয়ে । এইবার তিনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন । ছাতের আলসেতে উঠে নাকি জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়াতেন । তাঁকে তখন আব্রু রক্ষার জন্য কোমরে বেল্ট দিয়ে বেঁধে প্যান্ট পরিয়ে রাখতে হতো যাতে সহজে না খুলতে পারেন । তাতেও লাভ হতো না । শুধু যদি একবার ঐ বড় ভাসুর রক্তচক্ষু করে সামনে এসে দঁড়াতেন, শাশুড়ি ভয়ে নীল হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়তেন । বংশরক্ষার দায় বড় দায় । তাই তৃতীয় বার আরেকবার চেষ্টা করা হয় । এইবারের চেষ্টায় সাকেতের জন্ম । তার বাবা হিসাবে রামপ্রসাদ নিজের নামটিই দেন । শুধু তাকে কেন, সবকটি সন্তানকেই তিনি নিজের বলে, নিজের দায়িত্বে মানুষও তিনিই করেন । রামাশ্রয় আবার নিজের ভবঘুরে জীবনে ফিরে যান । আর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন আমার শাশুড়ি । এই কাহিনী এখন খুব অল্প কয়েকজন মনে রেখেছে । আমার বিয়ের পর আমার এক কুচক্কুরে খুড়িশাশুড়ি এসে আমার শাশুড়ির নামে খুব খানিক কুচ্ছো করে যান্ । তাঁরই কল্যাণে এ গল্প আমি জানতে পারি । প্রথমটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি । বিয়ের কিছুদিন পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাকেতের কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম । ওর মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল । বুঝতে পেরেছিলাম যে ও জানে এই কাহিনী সত্যি, যদিও এটা নিয়ে কখন ও আলোচনা হয়না । এখন তুই – তুই আমায় বল শাশ্বতী – যে সমাজ একটা নিরপরাধ নিরীহ মেয়েকে পাগল করে দিয়ে বংশ রক্ষা করায়, সে সমাজ কে নিয়ে আমি কি করবো ? আমার মেয়ে ভালবেসে একজন মানুষ কে বেছে নিয়েছে – কারুর চোখ রাঙানিতে নয় । তবু সে অপরাধী ? বল – উত্তর দে ।' শাশ্বতী দাঁড়িয়ে রইল । রাতজাগা কুকুরের দল তখনও ডাকছে ।

গল্প

নোনি, ছোট্ট মনি আর অনেকটা - - - - গর্ব

শাশ্বতী ভট্টাচার্য্য, ম্যাডিসন, উইসকনসিন

রবিবার সকাল, রোদে ভেসে যাচ্ছে ঘর। দুহাতে দুটো বড়ো সুটকেস নিয়ে রনেন বসার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, কাঁধে ফোলা ঢাউস ব্যাগের ভিতর দিয়ে গলফের নানা সরঞ্জাম উঁকি দিচ্ছে। 'এই নাও, এই বার তোমার সব জিনিষ এই দুটোতে পুরে ফেলো ....., কাজ শেষ ! আমি বেরোলাম তাহলে'।

টান টান করে বাঁধা চুল মোটা গার্ডারে আটকানো, মাথায় হেলমেট, ঝকঝকে মিষ্টি হাসি হেসে ইনা দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। 'মা, রেডিওটা চালিয়ে নাও ..... এই সময়টাতে ভালো ভালো ক্ল্যাসিকাল মিউজিক বাজে, খুব ইন্সপায়ারিং ..... তোমার কাজে মন লাগবে, আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে ..... বাবা, ওয়েট ! আমি আগে বেরোই, তার পরে তুমি গাড়ি বার করো !' গোলাপি রঙের সাইকেলে টিং টিং আওয়াজের সাথে একটা উড়ন্ত চুমু বাতাসে ভেসে আসে।

তার পরে পরপর গ্যারাজের দরজা খোলা, গাড়ির স্টার্ট, আবার গ্যারাজের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ .....

সায়নী ঘরে ঢুকে বড়ো একটা শ্বাস নেয়। ওর কোন তাড়া নেই ..... ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছেটানো, রকমারি জিনিষ। জামা-কাপড়, সোয়েটার, স্কার্ফ, শ্যাম্পু, লোশন, ভেসলিন, চিরুনি, টুথব্রাশ, চকোলেট .....

সত্যি কি কোন তাড়া নেই ?

আজ রবিবার না ? তাড়া কিসের ? তিনমাসের ছুটির পুরো একটা মাস কলকাতাতে কাটানোর পরিকল্পনা নেই যেন সায়নীর ?

কতদিন বাদে আবার বাবা, মা, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন সবার সাথে দেখা হবে, গড়িয়াহাটার হকার মার্কেটে আমেরিকান ডলারে বাজার করার সুখ, লেকমার্কেটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দরাদরির মজা, গড়িয়ার মোড়ে গরম কচুরি, তেলেভোজা, আলু কড়াইশুঁটির সিঙ্গারার মধ্যে ছোটবেলাকে আবার ফেরৎ পাওয়া, তবুও কোথায় যেন কতগুলো 'কিন্তু' রয়ে যাচ্ছে !

যাঃ দেখতে দেখতে সাড়ে নটা .....

অন্য দিন হলে গরমের ছুটির এই রোদ, এই চোখ ধাঁধানো আলোর দিনে সায়নী মোটেও ঘরে বসে থাকতো না। সকালে উঠে ও নিজেও বেরিয়ে পড়তো সাইকেলে চেপে। ঘর ছাড়িয়ে, বাড়ির সামনে পার্ক ছাড়িয়ে রাস্তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চক্কর দিতো।

সারা বছর ঠান্ডা, এই সময়টাই ইলিনয় এ নিখুঁত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, বৃষ্টি কিম্বা তুষারপাত নেই, মেয়ের পড়াশোনার চাপ নেই, স্কুলে তিনমাস গরমের ছুটি, তার মানে কোন একটা অছিলায় সকাল থেকে সন্ধ্যে, মানে রাত নটা অবধি বাইরে থাকা। রনেনও এই সময় ইচ্ছা করে কাজের চাপ কম রাখে। প্রাতঃরাশের সময় তার ছোট্ট মন্তব্যটা মনে পড়ে সায়নীর। 'এতো বছর পরে কলকাতা যাচ্ছো, কিন্তু মায়ের জন্য কি উপহার নিয়ে যাবে এই সামান্য সিদ্ধান্ত নিতে হিমসিম খাচ্ছো ? কি গো !'

এমন একটা দিনে সায়নীর মতো কজন ঘরে থাকে ? কিন্তু কজনেই বা গরমের তিন মাসের ছুটির একমাস সাত সমুদ্দর তেরো নদী পার হয়ে কলকাতায় কাটাতে যায় ?

বাড়ির থেকে বেরোনোর আগে ইনা রেডিও চালিয়ে গেছে। মনের মতো নরম একটা পিয়ানোর সুর বাজছে, তবু কেন তার মন এতো উতলা হয়ে আছে ?

সায়নী ভাবে ঠিকই তো, সে না একটা চল্লিশ বছরের বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে ? কেন একটা মন খারাপী চিন্তায় বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে ও ?

মন খারাপ না দুশ্চিন্তা ? সায়নী জানে। নিজের কাছে রাখা এই প্রশ্নের উত্তর, ওর নিজের কাছেই আছে।

ও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

একা একা এতদিন বাদে দেশে ফেরার উদ্বেগ, কলকাতায় গিয়ে একমাস সুস্থ থাকার চিন্তা তো আছেই। আবার সেই চিন্তা ছাপিয়ে আর একটা বড়ো চিন্তা। গত দশ

বছর দেখা হয় নি যাদের সঙ্গে এই এতদিন পরে সেই প্রিয় সবাইকে হঠাৎ ভীষণ বয়স্ক দেখার চিন্তায় ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

দশবছর ? বাবাঃ ! এতদিন পরে ? কেন ?

সেই প্রশ্নের জন্য ভিসা, টিকিটের দাম সহ যথেষ্ট পরিমাণ পরিবর্তনের অজুহাত জমা পড়েছে।

দশ বছরে অনেক কিছু পাল্টিয়ে গেছে ..... ।

ছোট্ট ইনা এখন ক্লাস এইটে পড়ছে, রনেনের বায়োটেক ব্যবসা জমে উঠেছে, হাইস্কুলে শিক্ষিকা পদে ওর নিজের স্থায়ী ভালো মাইনের চাকরী হয়েছে, অবশেষে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে।

তাহলে দেশে বাবা মায়ের জীবনের পরিবর্তনটা মেনে নিতে কেন ওর দ্বিধা হচ্ছে ? জীবনের নাম পরিবর্তন কথাটা কে বলেছিল না ?

ছোট একটা হার্টএট্যাকের পর ব্যবসা বিক্রী করে দিয়ে সত্তরোর্ধ ডঃ রায় এখন ঘরে বসা, কলকাতার শহরতলীতে বাড়ি কিনে ফুলের বাগান আর পড়াশোনা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। পাড়ার লোকেরা মাঝে মাঝে ডাক্তারী শাস্ত্রে উপদেশ নিতে আসে। যেই মায়ের বয়স ওর ছোটবেলায় 'পঁয়ত্রিশ এর কাছাকাছি'ইর উপরে উঠে নি কখনো, সেই মায়ের বয়স ষাট ছুঁতে চলল।

পৃথিবীর একপ্রান্তে মহাদেশ আমেরিকার ইলিনয় থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে উপ-মহাদেশ কলকাতায়। প্রস্তুতি কিছুতেই শেষই হতে চায় না। রনেনকে সায়নী কথা দিয়েছে, রবিবার ছুটির দিন শেষ হওয়ার আগেই ওর ব্যাগ - গাছানো শেষ করে ফেলবে।

সায়নীর মুখে হাসি ভরে আসে, আসার সময়ে আবার এই দুই ব্যাগ-ভর্তি জিনিষ আসবে, তার মানে একমাসের মধ্যে ঘন ঘন বাজারে যাওয়া, মায়ের সাথে।

চিত্রকল্পটা মনে মনে ঝালাই করে ও, আর মুখের হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

একটাই অসুবিধে।

অসুবিধেটা শুধু সায়নীর।

শ্রীমতি সরমা রায়ের 'কথা', মেয়ে সায়নীর নামে ....., সেই ছোটবেলা থেকেই .....

'এই যে, আমার মেয়ে ! দেখে বুঝবেন ক্লাস টেনে পড়ে ? দুদিন বাদে হাই-সেকেন্ডারি দেবে ? বড়ো হয়ে সায়ান্স টিচার হবে, দেখুন না ! কি একটা জামা পড়েছে ? যেন কলসী থেকে বার করা হয়েছে ! কোন দিকে ওর খেয়াল নেই !'

রাস্তার ওপরে হাঁটু সমান উচ্চতায় দোকান, কাঠের পাঠাতনে এক রাশি পানের পাতা, 'কেন ? জামা তো ঠিকই আছে !' হাতের গামছায় মুখ মুছে, পাশের ছোট পিতলের ঘটি থেকে জল হাতের আঁজলায় ঢেলে পাতার ওপরে ছেটাতে ছেটাতে পান-ওয়ালা উত্তর দিয়েছিল।

'মা ! ....., জামাটা নাহয় একটু বেশি দলামোচা হয়ে আছে, ইস্ত্রি করা জামা পরে কে আবার পান-সিঙ্গাড়া কিনতে যায় ? দুদিন বাদে নয়, হায়ার সেকেন্ডারি দিতে আরো দুবছর বাকি। ক্লাস-টেনে থেকে ক্লাস টুয়েলভ্ এ ওঠা। হিসাব করো, দু বছর ইজ নট ইকোলটু দুই দিন।'

সরমা দেবী চুপ করে গিয়েছিলেন। অন্তত সেই দিনের জন্য।

আলমারীর বিভিন্ন তাক খুঁজে, ছড়ানো জামা কাপড়ের তাল ঘেঁটে চারটে স্কার্ট, রং মেলানো টপ, আর গলায় জড়ানোর পাশমিনা স্কার্ফ বার করে সায়নী। জামাকাপড়গুলো আধুনিক, বেশ আমেরিকা-আমেরিকা ছাপ্পা আছে, সযত্নে ভাঁজ করে সুটকেসে রাখে। পাড়ার মধ্যে মায়ের পড়শি-বন্ধুদের বাড়ি, এদিক ওদিক যেতে কাজে লাগবে। 'এই যে আমার মেয়ে, আমেরিকা থেকে এসেছে, দেখে কে বলবে যে এই মেয়ে আমেরিকাতে সায়ান্স টিচার ! এইয়া লম্বা লম্বা সাহেব মেমসাহেবদের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, আমার জামাইও তেমনি হীরের টুকরো ! আসতে পারলো না ব্যবসার কাজ তো, ছুটি পায় না সহজে'।

চোখের দেখায় কারোর বৃত্তি বোঝা যায় কিনা, রনেন সত্যি কয় রতি হীরের টুকরো, কিম্বা রনেনের অনুপস্থিতি নিয়ে পাড়া-পড়শিদের কাছে এত কথা বলার প্রয়োজন আছে কিনা, মায়ের সাথে সেই তর্কে সায়নী যাবে না।

কোন লাভ নেই তাতে।

সেও আরেক গরমের ছুটির দিন। ঘরে ঘরে ফেরি করে সব্জি বিক্রী তখনও চালু হয় নি।

সকালে উঠেই ওর সখ হয়েছিল মায়ের সাথে বাজারে যাবে। 'চল তাহলে, বাঘাযতীন স্টেশনের বাজারে, ভালো মাছ আসে ..... আমি যখন দরাদরি করবো কোন কথা বলবিনা!'

মেছোনি মাসি মায়ের চেনা। ছোটখাটো রোদে পোড়া চেহারা, শরীরের কোথাও এক আউন্স মেদ নেই, একটাই লম্বাটে কাপড়ের খানিকটা দিয়ে পেছন ঢেকে, বাকি কাপড়টা মাথায় ঘোমটার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

সামনের বাঁশের কঞ্চির ঝোলা, তাতে চুনো পুটি, কয়েকটা মৃগেল।

'ও মাসি, তোমার মেয়ে নাকি?'

'হ্যাঁ গো দিদি, মেয়ে, আমার পেটের মেয়ে।'

'বেশ ডাগরটি হয়েছে তো!'

'নানা!, এমন কিছু ডাগর হয় নি তো! ও দেখতে একটু বড়ো-সড়ো, মোটে সাজাগোজা করে না বলে আরো বেশি বয়স্ক দেখায়, এই দেখো না! চুলটুলো কেমন? বলি যা, ববছাট কর, শোনে না।'

মাছ-ওয়ালী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, 'তা মাসি, মেয়ের বিয়ে দেবে না?

'না না! ছিঃ, বিয়ে? এখন কি? এই বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে কি ওকেও আমি বিয়ে দিয়ে দেবো নাকি? কি বলছো তুমি?' সরমাদেবী ঘন ঘন মাথা নেড়ে তিরস্কার করে উঠেছিলেন, 'এখন ও কত পড়াশোনা করবে! বিয়ে হলেই তো সংসারের ঠেলায় পড়াশোনা মাথায় উঠবে। ফারস্ট ডিভিসনে পাশ করেছে, কথায় বলে না? লাখোমে এক, ও সেই!, একেবারে ছেলে মানুষ, এখনও মাকে নিয়ে বাজারে যেতে হবে! এদিকে কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, আমি তো বলি যা ইচ্ছা হয় কিনে নি গে যা! নাকি পছন্দই করতে পারেনা, চুলটা পর্যন্ত আমায় বেঁধে দিতে হয়!'

'বাব্ বা্ ' কথার তোড়ে মেছোনি হার মেনেছিল, গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়া দেখিয়ে বলেছিল, 'মাসি, মাছ খুব টাটকা হবে, নিয়ে যাও, এই আসার আগেই ঝাঁপ নাগিয়েছি, লিয়ে যাও গো, সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছি!'

মায়ের ওপর সায়নী ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ও নিঃসন্দেহ, মাছওয়ালী একটা খদ্দেরের জন্য আর বেশী সময় দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাই কথা ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

'একটা গ্রাম্য মাছ-ওয়ালার সঙ্গে অতো কথা বলার কি আছে? পয়সা ফেলবে, জিনিষ কিনবে, অতো হাটের গল্প তোমার কে শুনছে? সোজাসুজি হেঁটে চলে এসো না?' বাজারে একগুচ্ছ চেনা-অচেনা লোকের মধ্যে কয়েকজন চলে যেতে যেতেও ওর দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছিল, কতকগুলো ন্যাংটো বাচ্ছা ছেলে, সর্দি পড়ছে নাক থেকে, হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

'আমি কি সং নাকি?' ওর ইচ্ছা হয়েছিল ফর ফর করে গত-রাত্রের শক্ত করে টেনে ওপরে তোলা টাইট বিনুনী খুলে ফেলতে ..... চাপাস্বরে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, 'লোকের কাছে এতো মেয়ের নামে বলার কি আছে? তোমার কি একারই মেয়ে নাকি এই এত বড়ো দুনিয়ায়? আর কটা মাকে শুনেছো তোমার মতো দিবারাত্র মেয়ের ঢাক পিটিয়ে বেরাচ্ছে?'

সরমা দেবী ওর কথায় থেমে থাকেননি, উল্টে ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'এখানে কয়টা মায়ের তোর মতন এই রকম চ্যাম্পিয়ান মেয়ে আছে? তোর বাবা আর আমি নিজেরা এমনকি সিনেমা পর্যন্ত দেখি না, তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে তোকে পড়িয়েছি! বলবো না কেন?' তারপরেই সহসা চুপ করে গিয়েছিলেন।

চোখের কোন দিয়ে সায়নী দেখেছিল ডান হাতের তর্জনি বেশ কিছুক্ষণ কপালে ছুঁইয়ে রাখলেন ওর মা। সব্জী বাজারের ব্যাগটা তখনও অন্য তিন আঙ্গুলে ঝোলান। বিড়বিড় করে কিছু বলছেন যাতে মেয়ের ওপর নজর না লাগে।

সায়নী যত্ন করে কনট্যাক্ট লেন্সটা ভ্যানিটি ব্যাগে রাখে, চশমার বদলে কনট্যাক্ট লেন্সে দু-চার বছর কম দেখায়, মেকাপ বক্স খুলে দেখে নেয় দু তিনটে রঙের লিপস্টিক,

আইস্যাডো, মাসকারা আইলাইনার, আছে কি না, একটা সিল্কের কাপড়ে জড়িয়ে বাক্সটা ক্যারি-অন ব্যাগে ঢোকায়, ওটা ওর সাথে থাকবে । প্লেন মাটি ছোঁয়ার আগেই এটা কাজে লাগবে । হাতের কাছে থাকা ভালো ।

এয়ারপোর্টের ভিজিটার সেন্টারে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে মা । কেউ জানেনা অচেনা অজানা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কান সম্ভাব্য আরোহীর গুণের বৃত্তান্তে কতটা ঝালাপালা হয়ে থাকবে ! চুল শুকনো করা আর পাকানোর জন্য রেভলনের কার্লার আর দেশের ৪২০ ভোল্টে চলার উপযোগী এডাপ্টার কেবল-তার সমেত গুছিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢোকায় সায়নী । ওটা বড়ো সুটকেসে যাবে ।

সায়নী এদিক ওদিক তাকায়, ঘরের আসে পাশে তাকায় । খোঁজে মায়ের বন্ধুদের কাছে নিজের বয়সটাকে ঠিকমতো পেশ করার উপযোগী আর কি বাক্সে ভরা যায় । টেবিলের ওপর নানা ছবির একটা ওর নজর কাড়ে ।

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এর ব্যাকড্রপে ওদের তিনজনের ছবি, চেয়ারে বসা বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে মা, কোলে তিন মাসের সায়নী । কলকাতার স্টুডিয়োতে তোলা । আনন্দ মায়ের সারা মুখে ফুটে বেড়োচ্ছে, ঘন চুলের মোটা বিনুনি কাঁধের এক ধারে ফেলা ।

সায়নী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কতই বা বয়স মায়ের ! মোটে আঠারো বছরের তফাৎ দুজনের মধ্যে । পড়তে পড়তে বিয়ে, তারপরেই কোল আলো করে কন্যা সন্তান এসেছে, কথাটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে সায়নীর ।

অনেকেই ভুল করে ওদের দুজনকে দুই বোন মনে করতো ।

ওর রাকেশ সিংজীর কথা মনে পড়ে ।

হায়ার সেকেন্ডারির পরীক্ষার ঠিক একমাস আগে । রাত জেগে পড়াশোনা করার সময় ।

দুপুর বেলায় মেঝেতে শিতল পাটি বিছিয়ে সায়নী, সামনে খোলা ক্যালকুলাস আর ট্রিগোনোমেট্রির দুটো মোটা বই । সেই সময়টাতে প্রত্যেক দিন একটু অঙ্ক করাটা ওর রুটিনের মধ্যে । সামান্য কয়েকটা অঙ্ক, নিয়মিত করতে পারলে ফরমুলাগুলো মাথায় ঠিক থাকে । রান্না ঘরের মায়ের বাসন পত্র গোছানোর ঠুংঠাং শব্দের সম্মোহিনী মায়ায় কখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল ।

হঠাৎ ঘনঘন ইলেক্ট্রিক বেলে আর তার সাথে দরজায় খঠাখট শব্দে ওর দিবা-নিদ্রা ভেঙ্গে গিয়েছিল ।

‘সায়নী চলতো ! রবিবার, এই সময় কে আসলো ?’ মায়ের ডাক শুনে ও উঠে পড়েছিল । ‘নিশ্চই তোর বাবাকে ডেকে পাঠানোর জন্য লোক পাঠিয়েছেন ডঃ ঘোষ ।’

ডঃ রায় আর ডঃ ঘোষের ছোট নার্সিং হোমে রুগীর সংখ্যা কখনো দশ বারোর বেশি হয় না, দুই পার্টনার বন্ধু ভাগাভাগি করে রাউন্ড দেন, দুই বন্ধুর মধ্যে বোঝাপড়া আছে, নিতান্ত জরুরী দরকার পড়লেই একে অপরকে ডেকে পাঠান ।

‘এদিকে তো সকালের রাউন্ড সেরে বাড়ি ফিরে, ডঃ রায় অন্য কাজে বেরিয়ে গেছেন ।’ মায়ের স্বগোক্তি শুনেছিল সায়নী ।

দরজাটা খুলেই খদ্দরের কুর্তি আর পাজামা পরা অপ্রত্যাশিত এক বিহারি ভদ্রলোককে দেখে থমকে গিয়ে চট করে মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সায়নী ।

ভদ্রলোক ওদের দুজনের একবার দেখেই মাথা নামিয়ে ফেলছিল, তারপরে গলায় অপত্যস্নেহ মিশিয়ে বলেছিল, ‘বিটিয়াদের ঘুম ভাঙালাম তো ! রাকেশ সিং আছি, আপনার বাবুজীর নার্সিংহোমে নতুন জয়েন করলাম, ডঃ ঘোষ এই খৎটা দিলেন ডঃ রায়বাবুকে দিতে জন্য । বিটিয়ারা, যা যা, দৌড়ে বাপুজিকে ডাকিয়ে দেও !’

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সায়নী খিল খিল করে হেসে ওঠেছিল ।

হাসির দমকে দমকে নিজের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছিল ‘শুধু এইটো বিটিয়া আছে, আর এই অন্যটি মা আছে’ ।

ওর হাসিতে সদ্য-নিয়োজিত দরোয়ান থতমত খেয়ে গিয়েছিল, বার-বার জীভ বার করে মাথা নেড়ে ছিল, ‘এতো বড়ো সরম কি বাত করে ফেল্লাম, এখনো ভালো করে এই শহরের রাস্তা ঘাটও চিনিনা’ ।

সায়নীর ততক্ষণে সাহস বেড়ে গেছে, সোজা বাংলায় বিহারী দারোয়ানটাকে ধমক দিয়েছিল, 'শহর চেনো না তো চিঠি বিলি করতে বেরিয়েছো কোন সাহসে ?'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েছিলেন সরমা দেবী । দারোয়ানের বাংলা-বলাকে উৎসাহিত করার জন্য ওঁনার নিজস্ব হিন্দী বলেছিলেন, 'না না সরমের কোন বাত নেই, ডাক্তার-বাবু তো বেরিয়ে গেছেন । উপরন্তু আপনি ঘরকে আইয়ে, কুছ নাস্তা, ঠান্ডা পানি পিতে যাইয়ে,' সায়নীকে বকে ছিলেন 'তুই ঘরে যা তো !, আজ বাদে কাল পরীক্ষা' হাসতে হাসতে ততক্ষণে সায়নীর পেটে খিল ধরে গেছে, মায়ের বকার উত্তরে বলেছিল, 'আজ বাদে না মা ! সরি সরি 'দিদি', ও না না সরি, 'বহিনজি', স্কুল খুলতে এখনো এক সপ্তাহ বাকি' ।

তারপরে আবার পড়ার ঘরে মেঝেতে গিয়ে বসেছিল ।

ততক্ষণে খদ্দরের কুর্তি দারোয়ানটি তখন জুতো খুলছে, 'মাফ করে দেবেন বিবিজি, আপনাকে বুঝতে পারিনি,' দরোয়ানটিকে সোফায় বসিয়ে সরমা দেবী সরবত খাইয়েছিলেন, সায়নীকে ক্যালকুলাসের বই কোল থেকে নামিয়ে, দারোয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, 'এই আমার মেয়ে, মাত্র ষোল বছর, এর মধ্যে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিচ্ছে, দুবার ডবল প্রমোশন পেয়েছে'।

একটা ঝালার মতো দ্রুত তালে বেজে পিয়ানোর প্রোগ্রামটা শেষ হয় ।

ভাষিকার গলায় একটা নতুন অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার ঘোষনা শুনে সায়নী যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘরের চারপাশে তাকায় । চর্তুদিকে ছড়ানো মোটা-মোটা ভারী-ভারী শ্যাম্পু আর লোশনের মধ্যে চারটে নোনির বোতল শোভা পাচ্ছে । বোতলগুলোকে ঠিক কি করে সুটকেসে ভরবে চিন্তা করে সায়নী ।

এই জিনিষগুলো ও নিয়ে যাচ্ছে ওর মায়ের জন্য ?

অস্বস্তিতে সায়নীর ভ্রূ কুঁচকে আসে, দশ বছর পর মায়ের সাথে দেখা হবে, চার বোতল নোনি নিয়ে ?

সায়নী একদৃষ্টে কালো রঙ্গের এক লিটার বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ।

আশ্চর্য ! এক সপ্তাহ আগে ও জানতোই না এই নোনির অস্তিত্বের কথা ।

বাবার হঠাৎ ফোনটা অফিসে এসেছিল । ফোনে ইন্ডিয়ার নম্বর ....., উদ্বিগ্ন হয়ে ফোনটা তুলেছিল সায়নী ।

দুদিন আগে তো কথা হয়েছে মায়ের সাথে, হঠাৎ কি ব্যাপার !

'বাবা ! সব ভালো তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সব ভালো, তুমি আসছো, হঠাৎ ফোন করতে ইচ্ছা হলো !'

'তা বেশ তো, ভালো কথা ।' সায়নী কথা খুঁজে পাচ্ছিল না ।

'তোমার মা বাড়িতে নেই, তাই এখনই ফোন করছি ! একা আসছো, যত পারো কম জিনিষ আনবে, এখানে সব পাওয়া যায়' ।

'নিশ্চই, ওখানে যা চট করে পাওয়া যায় না সেই রকম জিনিষই সব নিয়ে যাচ্ছি !' সায়নী হেসেছিল ।

'শোন, আমার কিছু লাগবে না, তবে তোমার মায়ের জন্য কিন্তু অবশ্যই কিছু এনো, উনি তো জানো নিজের থেকে তোমায় কিছু আনতে বলবেন না ।'

'জানতাম, তুমি বলো তো মায়ের জন্য কি নিয়ে যাই ?'

ডঃ রায় সহসা চুপ করে গিয়েছিলেন । সায়নী আন্দাজ করেছিল বাবার সংকোচ হচ্ছে, বাবাকে সহজ করার জন্য বলেছিল, 'তা হলে শোন, তোমার জন্য কি আনছি !'

'তোমার কষ্ট হবে না ? এতো কিছু আনতে ?' সায়নী মজা পেয়েছিল, এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিল উল্টে বাবাকে প্রশ্ন করে, ও কি নিয়ে আসছে সেটা না জেনেও কি করে এই প্রশ্নটা আসে ! আবার ওর মনে এটাও পড়েছিল পুজোর সময় স্টলে স্টলে ঘোরার সময় ও কতো বায়নাগুলো, 'খিদে পেয়েছে', 'বেলুন কিনে দাও না' 'ঐ জামাটা কি সুন্দর !', নিজেকে সামলিয়ে হেসে উত্তর দিয়েছিল 'না বাবা, না তো ! কোন অসুবিধে নেই' ।

কিছুদিন আগে মায়ের হাতে লেখা চিঠি পেয়েছে, তাতে যেমন বলা আছে, সেই রকম জিনিষ ও কিনেছে, বাবাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল 'ছোট কাঠের তৈরী তিন-ডাইমেনসানাল লেগো সেট, ডিজিটাল ঘড়ি, দেশ বিদেশের ডাক্তারী শাস্ত্রের গল্পের সংকলন, একটা ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে যেতে কি আর এমন অসুবিধে' ।

ডঃ রায় গলার স্বর নামিয়ে বলেছিলেন, 'শোন তাহলে, তোমার যদি সুটকেসে জায়গা থাকে, তাহলে বরঞ্চ তুমি মা, একটা কি দুটো বোতল নোনি রস নিয়ে আনতে পারবে ? ঘোষদা বললেন আমেরিকাতে খুব ভালো নির্ভেজাল টাটকা নোনি এক্সট্র্যাক্ট পাওয়া যায় ..... তোমার মায়ের কাজে আসবে' ।

'নোনি ?, সেটা আবার কি বাবা ?'

'নোনি একটা ফল, তার রস খুব একটা দারুণ স্বাস্থ্যকর জিনিষ, এলোপ্যাথিতে তো সব অসুখ সারে না .....,' ডঃ রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, বহু বছর চিকিৎসার উপলব্ধি, 'আসলে তুমি তো সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত, তাই নোনির কথা জানো না, এখানে তো নোনি নিয়ে দারুণ হইচই হচ্ছে, ডায়াবিটিস ...., বাত ....., অনেকেই নাকি ভীষণ উপকার পাচ্ছে' ।

'আমেরিকাতে পাওয়া যায় তুমি জানো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ । আমেরিকাতে সব পাওয়া যায়, ধন্যন্তরীর বাগানের সুধা পাওয়া যাবে না তা কি হয় ? তুমি এক বোতল নোনি এনো তোমার মায়ের জন্য' ।

'তা নোনিতে কি হয় বাবা ? ডঃ ঘোষজেঠু হঠাৎ মায়ের জন্য নোনি প্রেসক্রাইব করলেন কেন ?' সায়নী ততক্ষণে ফোন নিয়ে টিচার্স রুমের বাইরে চলে এসেছে ।

'বলছি মা !, বলছি,' সায়নী ফোনের ওধার থেকে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ পেয়েছিল, 'তোমার মায়ের জন্য আনবে আমার জন্য' ।

'বাবা, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা' আচমকা ওর মনে পড়েছিল বাবার বয়স ঠিক বাহাত্তর !

'শোন মা', ডঃ রায় আবার বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, 'আমি আজকাল বেশি দৌড়-ঝাপ করতে পারি না তো, তাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে তোমার মায়ের ওপর বড্ডো চাপ পড়ে যাচ্ছে, তাই ভাবছি নোনির রস খেলে যদি উপকার হয় । ওতে শরীরে বল আসে, ব্যথা সব চলে যায়, ভালো হজম হয় । তুমি অবশ্যই তোমার মাকে এতো কিছু বলো না, আগে তো তোমার আনা আমেরিকার জিনিষটা দিয়েই শুরু করি, শেষ হলে নয়তো এখান থেকেই কিনে নেবো' ।

সায়নীর ইচ্ছা হয়েছিল, বাবাকে জিগেস করে, এতো কিছু হয় যখন, নোনি খেলে বাবার প্রশস্ত্ব টাক মাথায় আবার নতুন করে চুল গজানোরও সম্ভাবনা আছে কি না, কিন্তু তখনই অন্য আর একটা চিন্তা ওকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল ।

প্রতি সপ্তাহে মায়ের সাথে কথা হয়, সেই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বাবা মায়ের সংসারের একটা ছবি ওর মনে তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু বাবার কাছে শোনা কথাগুলো তো তার সাথে মিলছে না !

'রিটায়ার করার পর তোর বাবা আমাকে ঘরের কাজে ভীষণ সাহায্য করে, এই তো সেদিন চারটে লোক ডেকেছিলাম, বাজার দোকান আমি করে আনলাম, তোর বাবা, তরকারি কুটে, এমনকি লুচির ময়দা পর্যন্ত মেখে দিলো' ।

'তোর বাবা আজ যা মাছের ঝোল বানিয়েছে না ! তুই যখন আসবি বাবাকে বলিস, তোকে পুরো রান্না করে খাইয়ে দেবে !'

'আজকাল তো আমি হালকা রঙের শাড়ি পরি ! তাতে তোর বাবা ভীষণ আপত্তি ! বলে আজকাল তুমি আর সাজো না কেন ?'

ওকে চুপ করে থাকতে বুঝে ডঃ রায়ই আবার সাড়া দিয়েছিলেন, 'কি হলো ফোনটা কেটে গেল নাকি ?'

'না বাবা ফোন ঠিক আছে, একটা কেন, আমি একেবারে তিনচারটে বোতল নিয়ে যাব বাবা' ।

ডঃ রায় আশ্বস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আর শোনো ? তোমার মায়ের জন্য কি আনছো ?'

'গরম মশলা, জাপানী সিল্ক, লোশন, শ্যাম্পু, সাবান চকোলেট এই সব' ।

‘বাঃ বাঃ, তোমার মা খুব খুশি হবেন পুজোর সময় নানা লোকজন আসে তো ! তোমার মায়ের খুব সুবিধে হবে, এবার রাখি তাহলে ?’ ডঃ রায় ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাবার কথা গুলো ভাবতে ভাবতে সায়নী আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, নিজের জন্য নয়, স্ত্রীর সুবিধে হবে মনে করে অজানা একটা ওসুধ পরীক্ষা করতে রাজি ডাক্তার মানুষটি, আমেরিকার জিনিষ সম্ভবতঃ ভেজাল নয় বলে ধারণা। তাই সেটা দিয়েই শুরু করতে চান। ঠিক নিজের জন্য নয়, স্ত্রীর জন্য, বয়সে পনেরো বছরের ছোট স্ত্রীর জন্য। এক মূহুর্তের জন্য হলেও বাবার মানসিক বোধের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে ওর সন্দেহ হওয়ায় ও লজ্জিত হয়েছিল।

নোনির বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ডঃ রায়ের কথাগুলো ওর আবার মনে পড়ে, আবার নতুন করে লজ্জিত বোধ করে।

মা কি হাসি খুশি !, যখনই ফোন করে সায়নী, একজন উচ্ছল চপল মহিলাকে পায় অন্য ধারে, মায়ের কথা গুলো ভাবে সায়নী।

‘সেদিন তোর বাবা বলছিলো আমি আজকাল গয়না গড়াই না কেন ? আমি বললাম কি হবে ? তখন তোর বাবা বলে কিনা, ... কেন আমি তো আছি ?’ আমিও বলে দিয়েছি, এই বুড়ো বয়সে তোমার খেয়াল হলো !’

‘তোর বাবা চায় আমি সব সময় সেজে গুজে থাকি। বল তো ! ঘরের কাজ করার সময় কেউ ভালো শাড়ি পরে ?’

‘তোদের ওখানে তো সোনার পালিশ করা গয়না-গাটিও অনেক দিন ভালো থাকে, এ কি কলকাতা ? এখানে সোনার জিনিষই দুই দিনেই কালি হয়ে যায় ?’

পনের বছরের তফাৎ বাবা আর মাতে, সায়নী চিন্তা করে রনেন যদি দু বছরের বড়োও হতো ওদের মধ্যে সম্পর্কটা এই এক রকম থাকতো ?

বড়ো বড়ো গরম মশলা প্যাকেট, ঘর সাজানোর জাপানী সিল্ক, গায়ে মাখার লোশনগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনটা খারাপ হয়ে যায় ! এইগুলো কোন উপহার হলো ? কতকগুলো কাজের জিনিষ, একমাস দুমাসেই শেষ হয়ে যাবে ! তাছাড়া ‘এই যে আমার মেয়ে এনেছে’ বলে বিলি করার কাজেই সব লেগে যাবে, মায়ের জন্য আর কি বা পড়ে থাকবে ?!

সায়নীকে চমকে দিয়ে রনেন ঘরে ঢোকে। ওর পিছনে মাথায় হেলমেট পড়া ইনা।

‘কি গো ? খেলা হয়ে গেলো ?

‘নাঃ! আজকে আর খেলতে ইচ্ছা হলো না, সকালে তোমাকে একা রেখে চলে গেলাম, হঠাৎ মনে হলো তোমার একটু সাহায্য দরকার, বেরোনোর সময় দেখলাম তুমি বেজায় নার্ভাস হয়ে আছো। আসার পথে মেয়েটাকে তুলে আনলাম, লক্ষ্য করে দেখেছি, মেয়েটা ঘরে থাকলে তোমার গলার জোর বাড়ে’।

সায়নী কৃত্রিম রোষে ফুসে ওঠে, ‘এ্যই থামো তো ! মেয়েটাকে বাজে বুদ্ধি শিখিয়ো না, সত্যি বলোতো পার্টনার বব আসে নি তাই না ?’

রনেন হেসে ওঠে ‘আমার গাড়ি ট্যাপ করেছো নাকি ? ক্যামেরা টামেরা লাগিয়ে রেখেছো কি না বলোতো ?,’ তারপরে যোগ করে, ‘বব না থাকলেও অন্যরা আছে, আমি চলেই এলাম’।

ইনা এসে জড়িয়ে ধরে সায়নীকে, ‘আমি তোমার ব্যাগ গোছাতে হেল্প করবো মা ? না কি দিদা আর দাদুনের জন্য একটা কার্ড বানিয়ে দেবো’।

সায়নী বলে ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই কর তুই, যা যা, তোকে কিছু করতে হবে না, বাবা তো আছে, তুই বরং দুটো সুন্দর কার্ড বানিয়ে ফেল’।

‘কি গো তুমি এখনো পা ছড়িয়ে বসে ? কিছু গোছাও নি ? সুটকেস গুলো ফাঁকা পরে আছে ?’ রনেন ঘরে উকি দিয়ে দেখে নিয়েছে। সায়নী মাথা নামায় ভাবে, এতদিন বাদে মায়ের সাথে দেখা হবে, একটা ভালো উপহার-এর কথা ভাবতে পারছে না ও ! এই না ও হীরের টুকরো মেয়ে !

কথাটা ভাবতে ভাবতে সায়নী উপলব্ধি করে, অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের দুজনকে দেখে ওর বিমর্ষ ভাবটা কেটে যাচ্ছে, আর তখনি হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মতো ও ভেবে উঠতে পারে মায়ের জন্য কি উপহার ও নিয়ে যাবে !

আর কোন কথা না বলে রনেনকে রীতিমতো অবাক করে দিয়ে সুটকেস, ঘর ভর্তি জিনিষ পেরিয়ে সায়নী আলমারির কাছে এসে দাঁড়ায়, আয়নার সামনে জুয়েলারি বক্স খুলে সযত্নে বার করে আনে আঠারো ক্যারোটের সোনার ওপর সিকি রতির হীরে বসানো ছোট্ট দুটো দুল । দুটো জ্বলজ্বলে ইংরাজী আই, ফুটকীর বদলে দুটো মনি । গতবছর ওর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল ইনা আর রনেন ।

যেন কালকের ঘটনা । চোখ বন্ধ করে ফেলে সায়নী । এই রকমের একটা দুলই ও দেবে মাকে ।

রনেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, দুলটা রনেনের হাতে দিয়ে সায়নী উত্তেজিত স্বরে বলে 'দোকান খুলে গেছে, এখনি এই রকমের একটা দুল কিনে আনো না ! আমি মায়ের জন্য নিয়ে যাবো' ।

'ঠিক আছে,' রনেন বেরোবার জন্য তৈরী হয়, 'যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে মাকে গিয়ে বলবে তো এটা ঠিক কার বা কাদের পছন্দ ?'

সায়নী হাসে, উৎফুল্ল স্বরে বলে, 'তা আর বলতে ? স্বামী আর কন্যার নামে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার অধিকার আমি ত্যাগ করছি না, আমিও আমার মায়ের মেয়ে ! গর্বের ট্রাডিশন যুগ-যুগ জিও' ।

রনেন হেসে চলে যাচ্ছে, সায়নী দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে, 'তুমিও আমার বাবার মতো স্ত্রীর প্রেমে ডগমগ থাকবে তো, তোমার সত্তর বছর বয়সে ?'

রনেন চোখ কপালে তোলে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবে, 'হাম যব হোঙ্গে ষাট সাল কি, তব তুম হোগি উনষাট কি ! কেসটা জটিল !' তারপরেই সায়নীর ভ্রূভঙ্গী দেখে রনেন উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, গভীর আশ্লেষে সায়নীর ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলে 'ভেবে দেখবো,' গাড়ী স্টার্টের আওয়াজ পায় সায়নী ।

রনেনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে সায়নী খোলা সুটকেসের সামনে আবার বসে পরে, যে কথাটা মনের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে সেই কথাটা জোরে জোরে বলে, গর্বিত বোধ করে, 'আর কয়টা এই বয়সের লোক এই রকম দিনে খেলা ছেড়ে এসে শাশুড়ির জন্য হীরের দুল কিনতে বেরোয় ! আর কয়টাই বা দশ বছরের বাচ্ছা মেয়ে খেলা ছেড়ে এসে নিজের হাতে কার্ড বানিয়ে দাদু দিদাকে পাঠায় !' তারপরে কখন নিজের অজান্তে সুটকেসের শক্ত নাইলনে হাত ছুঁইয়ে বলে ওঠে 'টাচ উড্, চশমে বাদ্দুর' ।

দুটো ভাষায় নজর কাটানোর মন্ত্র বলেও ওর শান্তি হয় না, 'নজর কাটানো' টাকে সম্পূর্ণ করার জন্য ছোটবেলা থেকে শোনা একটা অর্থহীন অব্যয় একটু জোরে বলেই ফেলে 'বালাই ষাট' ।

গল্প

সুডাইনা, কোবে, আর কোঙ্গান

শুভ্র দত্ত, সিয়াটেল, ওয়াসিংটন

'সুডাইনা' ।

হঠাৎ করে পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজটা শুনে চমকে উঠে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম প্রায় । জুনোর গলা । আমাদের ঘরের খাটটা বেশ উঁচু । তার ওপাশ দিয়ে কখন যে এদিকে এসেছে খেয়াল করতে পারিনি । সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, – কি ব্যাপার ?

'কোবে কোঙ্গান কাঁহা?' – ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় প্রশ্ন ।

নাঃ, একটু যে শান্তিতে বসে নিজের কাজ করব তার উপায় নেই । ছুটির দিন । রান্নার দিদি সকাল সকাল খাবারদাবার তৈরী করে দিয়ে চলে গেছে । পলিনা এখন ঢুকেছে স্নান করতে । বাড়িতে আর কোনো লোকজন তো নেই । এখন কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত, তাই খাতাগুলো নিয়ে বসেছিলাম । গতকালই তাড়া খেয়েছি, – 'সুধায়ন, সোমবারে সব কিছু জমা দিতে হবে কিন্তু' ।

আমি স্কুলে ভূগোল পড়াই । গত সপ্তাহে ফাইনাল পরীক্ষাগুলো শেষ হয়েছে । এক বান্ডিল পরীক্ষার খাতা নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে বসে দেখব বলে । এই সুযোগে খাতা দেখা শুরু করেছি, এমন সময়ে এই উৎপাত ।

বিরস মুখে বললাম, – 'দেখ জুনো, আমি একটু দরকারি কাজ করছিলাম । যাইহোক, কোবে শহরটা হচ্ছে জাপানে, সমুদ্রের ধারে, এই এখানে', – বলে দেয়ালে টানানো পৃথিবীর ম্যাপে দেখাই ।

জুনোর উচ্চতা ষাট সেন্টিমিটার, মানে দুফুটের একটু কম । ক্যাবলার মতো মুখ তুলে চেয়ে থাকে । ম্যাপটা একটু উঁচুতে । ওকে তুলে ধরে টেবিলের ওপর চড়িয়ে দিই । পলিনা বলেছে, শিশুদের কৌতুহল খুব ভালো জিনিস । শিশুদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে তার যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় । তাই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ।

জুনোকে অবশ্য শিশু বলা যায় না বোধহয় । জুনোর বয়স ছয় মাস বটে, কিন্তু জুনো কোনো ব্যক্তিনয়, যন্ত্রমানব । জুনিয়ার-রোবট । আমাদের বাড়ির তৃতীয় সদস্য । এটা অবশ্য আমার বন্ধু তথাগতর আইডিয়া । ওর ফার্টিলিটি ক্লিনিকেই একসময়তে গিয়েছিলাম আমরা দুজনে, বিয়ের পর সাত বছর কেটে যাওয়ার পরেও 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' হল না দেখে । সবকিছু দেখে টেখে তথাগত বলল, পলিনার তো হর্মোনের সমস্যা আছে রে । ওষুধ পত্র-ইঞ্জেকশনের ব্যাপারে আমি দেখছি । দেখা যাক কতদূর কি ফল হয় ।

তারপর বছরখানেক তেড়ে চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হল না । তথাগত শেষে একদিন বলল, – ফেল করে গেলাম মনে হচ্ছে । দেখি আরো ক'দিন । তবে তুইও একটা কাজ করতে পারিস । তুই একটা জুনোকে ঘরে আন । পলিনার মনটা ভাল থাকবে ।

জুনো মানে ?

জুনিয়র-রোবট । জিনিসটার নাম শুনিসনি ? ছেলেমেয়ে যাদের নেই এমন অনেকেই তো আজকাল সেটাই করছে ।

সেটা আবার কোত্থেকে পাবো ?

ওটা তৈরী হয় জাপান আর কোরিয়ায় । এ শহরে চার-পাঁচটা ডিলার আর ডিস্ট্রিবিউটার আছে । তারমধ্যে রোবোকিউট কোম্পানিটায় আমার চেনাশোনা আছে । কথাবার্তা বলব ? দরকার হলে জানাস ।

মাথা খারাপ হয়েছে তোর ? স্কুলে পড়াই । ওসব হাই-টেক জিনিসের দিকে হাত বাড়িয়ে মরি আর কি । এককাঁড়ি টাকা তো চাইবে । তখন কি করব ?

তা সেটা অবশ্য একটা ব্যাপার । তবে কি জানিস তো, যেসব মালে খুচরো খাচরা ডিফেক্ট থাকে, সেগুলো শুনেছি জানাশোনা লোকেদের মধ্যে বেশ সস্তায় বিক্রি করে দেয় । খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে ।

সেইমতোই ঘটল সবকিছু । এই হচ্ছে সে জুনো । তার আর সব নিখুঁত, কিন্তু অডিওতে একটু সমস্যা আছে । তা

বাচ্চারা তো আধো আধো কথা বলেই থাকে । তাদের সব কথা কি আর বোঝা যায় ? সেটা সমস্যা না । তবে জুনোর গলার স্বরটা বোধহয় আর একটু মোলায়েম হলে ভালো হত । টেবিলের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে সে আবার হেঁড়ে গলায় চেঁচাল, – 'কোঙ্গান কাঁহা রে ?'

রোজদিন ঘন্টাখানেক হিন্দি সিরিয়াল দেখে জুনো একটা জগাখিচুড়ি ভাষা রপ্ত করেছে । পলিনা বলে নাকি ওর শেখার ক্ষমতা অসাধারণ । অবশ্য সত্যি বলতে কি, জুনো যা করে তাই দেখেই পলিনা অদ্ভুত অবাক হয়ে যায় । সেদিন বলে, – 'জুনোর কেমন অসাধারণ মেমারি দেখেছ ? ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের সব কটা ট্যাক্সির নম্বর মনে করে রেখে দিয়েছে', কিংবা, 'দেখলে সাড়ে আঠেরোকে সোয়া সাত দিয়ে গুণ করলো কি তাড়াতাড়ি ! অঙ্কতে ওর জুড়ি নেই বুঝলে । তবে ওর ভাষাটা একটু, – আচ্ছা আমি নাহয় দু-চারটে ছড়া কবিতা ওকে শেখাব । আর ইতিহাস ভূগোল এগুলো, – আচ্ছা তুমি ওকে একটু ভূগোল শেখালে তো পারো ।'

শুনেই আমি 'এখন একটু কাজ আছে' বলে পালিয়েছিলাম । কিন্তু এখন কি করি ? ভেবে বললাম, 'জুনো, কোঙ্গান নামটা শুনে মনে হচ্ছে আফ্রিকাতে, না না বোধহয় ইন্দোনেশিয়ায় । আচ্ছা তোমাকে আমি পরে বলে দেব । এখন খেলা কর গে যাও । একটু টিভিও দেখতে পারো ।' – বলে ওকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিলাম ।

জুনো তবু যেতে চায় না । বলে, – 'কাঁহা রে কোরিয়া ?'

এমন জিজ্ঞাসু ছাত্র পাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক'জন শিক্ষকের হয় ? আমি আবার ওকে টেবিলে তুলে দিয়ে ম্যাপ দেখিয়ে বললাম, – 'এই দেখ উত্তর কোরিয়া, আর তার ঠিক তলায় দক্ষিণ কোরিয়া । ওই জাপানের কোবে থেকে খুব দূরে নয় । এখন যাও তাহলে ।'

জুনো মাথা নেড়ে বলল, 'কোরিয়া চিনু ডান –' ।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে চিন দেশে হচ্ছে কোরিয়ার ঠিক বাঁ দিকে, আর ডানদিকে জাপান । তার আগেই পলিনা ঘরে ঢুকল । বলে, – 'জুনো কি দারুন কবিতা আবৃত্তি করছে দেখলে ?'

আমি বললাম, 'না দেখিনি তো । কোথায়, কখন, কি কবিতা আবৃত্তি করল ?'

ওই যে এক্ষুনি তোমাকে শোনাচ্ছিল । আজ সকালেই সবে শিখিয়েছি । রবিঠাকুরের কবিতা –

কোন কবিতা ?

ওই যে, – শুধায়োনা কবে কোন গান, কাহারে করিয়াছিনু দান, – ।

অ্যাঁ, তাই নাকি ? – আমি জেনুইন অবাক হলাম ।

বুঝতে পারোনি !

নাঃ ওর কথা বোঝে কার সাধ্য । তুমি যদি আগে বলে দিতে, তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম ।

তোমাকে আরো একটা কথা বলা হয়নি । শুনবে ?

শুনতে কতক্ষণ লাগবে ?

সাড়ে-তিন সেকেন্ড । জুনোর ভাই বোন হবে । আসছে । মাস সাতেক বাদে ।

বলে একটা রহস্যময় হাসি হেসে জুনোকে কোলে তুলে নিয়ে পলিনা বাড়ির ভেতরে চলে গেল, আমি হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ।

নানা স্বাদের লেখা

ওরা কাজ করে

সুজয় দত্ত, ওহিও, অ্যামেরিকা

''শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে'' যে সৃজনশীল, শ্রমজীবী মানুষদের শুধু যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাওয়ার খতিয়ান রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, এ-গল্প এক অর্থে তাদেরই। শুধু এই কাহিনীর চরিত্ররা যে 'সাম্রাজ্যে' কাজ করেন বা করতেন, তা হল আমাদের আজন্মপরিচিত গৃহস্থবাড়ীর রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, উঠোন-দালান-বাগান আর তার 'সম্রাট' ও 'সম্রাজ্ঞী'রা হলেন আমাদেরই বাবা-কাকা-দাদু বা মা-পিসীমা-দিদিমারা। একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের বা পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়ীতে যেসব কাজের লোকের আনাগোনা দেখেছি, তাদের অনেকের সঙ্গেই অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তখন তো আর 'সোসিওইকোনমিক স্ট্যাটাস', 'সোস্যাল আন্ডারক্লাস' বা 'সাইকল্ অফ পভার্টির' মতো ভারী ভারী কথাগুলো জানতাম না, ওদের মোটের ওপর পরিবারের সদস্য বলেই মনে করতাম। ওদের কাছে আব্দার করতাম, ওদের সঙ্গে খেলতাম, দুষ্টুমি করতাম। শুধু কতগুলো ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগত, শিশুবয়সের কাঁচাবুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। যেমন, অনেকক্ষেত্রেই দোষ না করেও ওরা বাড়ীর বড়দের কাছে বকুনি খায় কেন, মাঝেমাঝেই রাগ করে 'কাল থেকে আর আসবনা, লোক দেখে নিও' বলে চলে গিয়েও আবার দু-তিনদিন পরে ফিরে আসে কেন, আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার বয়সী কচিকাঁচারা সক্কালবেলা ইস্কুলে না গিয়ে তাদের মা-দিদির সঙ্গে ঘর-গেরস্থালির কাজ করতে আসে কেন। ভাবতাম ওদের কী মজা, কত স্বাধীনতা। সাতসকালে ব্যাগ গুছিয়ে ইউনিফর্ম পরে বাস ঠেঙিয়ে সবিতাদির ক্লাসের গসাগু-লসাগু আর দেবযানীদির ক্লাসের প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য নিয়ে লড়তে হয়না, পড়া না পারলে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বা রুলারের বাড়ি খেতে হয়না। ওদের জীবনের এই 'মজা' আর 'স্বাধীনতার' আসল মানে যখন বুঝতে শিখলাম, ততদিনে আমার নিজের জীবনও অনেকটাই বদলে গেছে। কিন্তু সেকথায় পরে আসছি।

ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার পর প্রথম যাকে কাজের লোক হিসেবে বাড়ীতে আসতে দেখতাম, তার নাম পারুল। মায়ের দেখাদেখি আমিও বলতাম পারুলদি, যদিও সে ছিল মার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। প্রতিদিন সে ভোর পাঁচটা-সাড়েপাঁচটা নাগাদ কাজে আসত, আর প্রতিদিন তার শিলনোড়ায় মশলা পেষার শব্দে আমার ঘুম ভাঙত। রবিবার সকালে স্কুল নেই বলে যে একটু বেলা অবধি ঘুমোব, তারও কী জা আছে? পৌনে ছটার সময় আমাদের শোবার ঘরে ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দিতে ঢুকে প্রথমেই পারুলদি পাখাটা বন্ধ করে আলোটা জ্বালিয়ে দিত। পাখার হাওয়ায়, অন্ধকারে যে ঝাঁট দেওয়া অসম্ভব আর তখন ঝাঁট না দিয়ে পরে দিতে গেলে যে ওর অন্য বাড়ীর কাজে দেরী হয়ে যাবে – সেই পরিণত চিন্তাভাবনা ওই বয়সে আশা করাটা হয়তো অযৌক্তিক (যদিও এখন ভাবলে নিজের ওপর বেজায় রাগ হয়!)। তাই প্রতি সপ্তাহে আমার রবিবাসরীয় অভিযোগ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে মা একদিন ওকে বলেই বসল, 'কী এমন ঘোড়ায় জিন দেওয়া তাড়া থাকে গো তোমার ছুটির দিনে ? ঘরটা একটু ছেলেটা ওঠার পর ঝাঁট দিতে পার না ?' অগত্যা তারপর থেকে পাখা বন্ধ না করে স্রেফ স্পীড কমিয়ে আর প্যাসেজ থেকে আসা একচিলতে আলোয় ঘর ঝাঁট দেওয়ার একটা 'কম্প্রোমাইজ' পদ্ধতি বার করল পারুলদি। মুখে অবশ্য গজ্‌গজ্ করত – 'কোলের কচিটাকে আর পাঁচ বছরের বাচ্চাটাকে ভোর চারটেয় উঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসি গো বৌদি। আমাদের কপালই ঐরম –'।

বাস্তবিকই পারুলদি কখনো একা আসত না। ওর অনেকগুলো ছেলেমেয়ের এক বা একাধিক রোজই আসত আমাদের বাড়ীতে। তখন আমরা থাকি ছোট্ট দু-কামরার ফ্ল্যাটে, তাই সকালে একঘন্টা সওয়া ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যেত ওদের কাজ। আবার বিকেলে আসত অল্প খানিকক্ষণের জন্য। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ওর আমার বয়সী (বা আমার চেয়ে একটু বড়) ছেলেমেয়েদের কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হতাম আমি। স্কুলে না যাবার ব্যাপারটা তো আগেই বলেছি, এছাড়াও দেখতাম ওরা দিব্যি চা-মুড়ি বা চা-রুটি খায়। শুধু তাই নয়, বাসন মাজা আর ঘর মোছাতেও বেশ চটপটে। ভাবতাম কী করে, কার কাছে

শিখল ? আর চা-কফি তো বড়দের খাওয়ার কথা, ছোটদের জন্য তো হর্‌লিক্স-বোর্নভিটা-মল্টোভা । ঠিক একই প্রশ্ন জাগত ভোলা, নান্টা, পুঁটি আর চটপটিকে নিয়েও । পারুলদি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে আমাদের বাড়ীতে কাজে ঢুকেছিল ওদের মা, পাড়াশুদ্ধ সবাই যাকে ডাকত 'জিন' বলে । আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল এই জিনের, যা কখনো পারুলদিকে করতে দেখিনি । মাইনেটা মাসের শেষে না নিয়ে সারা মাস ধরে একটু একটু করে নেওয়া । প্রতি সপ্তাহে এক-দুবার বাবার কাছে নতমুখে আর্জি জানাত, 'দাদা, দশটা ট্যাকা দ্যাওনা । বড় দরকার' । বাবা কোনো কোনো দিন বিনাবাক্যব্যয়ে দিয়ে দিত, কখনো হয়তো বলত, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না জিন । এইতো সেদিন নিলে ! আজ আবার কী হল ?' তার উত্তরে প্রায়ই শুনতাম 'ভোলার বাবার আজ কাজ নেই' বা 'বেলা দশটার পর ভোলার বাবা ইঁটভাটায় গেলে জানা যাবে এ-হপ্তায় কাজ আছে কিনা' । ঠিক বুঝতাম না । ভোলার বাবা কী এমন কাজ করে যাতে বছরে আদ্ধেক দিন ছুটি ? আমাদের স্কুলেও তো সারাবছর অত ছুটি থাকেনা । আর বেলা দশটার পর জানা যাবে কাজ আছে কিনা ? আমার বাবা তো দেখি রোজ বাজার থেকে ফিরে চান করে খেয়ে ঠিক পৌনে নটায় বাসের লাইনে দাঁড়ায় আর সাড়ে নটায় অফিস পৌঁছয় ।

যাইহোক, আমাদের পাশাপাশি সরকারী ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর মধ্যে কাজের লোক নিয়ে মনোমালিন্য আর রেষারেষি লেগেই থাকত । কারণ একই লোক দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাড়ীতে কাজ করত আর সেসব বাড়ীর গিন্নীদের মধ্যে অগ্রাধিকার বা অনুগত্য পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলত । তার ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসল এক নতুন সমস্যা । সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আমাদের সরকারী ফ্ল্যাটের সারিসারি হলুদরঙা বিল্ডিংগুলোকে ঘিরে উঠতে লাগল একটার পর একটা দোতলা-তিনতলা বিলাসবহুল বাড়ী । পশ্চিম ভারত থেকে আসা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের । অনিবার্যভাবে তাদের যখন কাজের লোকের দরকার পড়ল, তারা হাত বাড়াল আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ীগুলোর দিকে এবং অবিশ্বাস্য সব মাসমাইনে আর উপরির (আধুনিক ভাষায় যাকে বলে পার্কস্) প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিনিয়ে নিল সেখানকার পুরনো লোকদের । মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরেদের ক্ষমতা ছিলনা সেইসব লোভনীয় 'পে-প্যাকেজের' সঙ্গে লড়ার । ফলে যারা এতদিন ধরে কাজের লোক হিসেবে আমাদের পাড়ায় ছিল পরিচিত মুখ, তাদের তো হারাতে হলই, উপরন্তু নতুন লোক পাওয়াও হয়ে গেল এক ঝটকায় অনেক দুরূহ । 'মার্কেট ফোর্স', 'সাপ্লাই-ডিম্যান্ড কার্ভ' ইত্যাদি কেতাবী অর্থনৈতিক বুলির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক পরে, কিন্তু ছোটবেলার দিকে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, ঐসবেরই তো খেলা চলছিল তখন । অতএব অচিরেই জিন-পর্বে ইতি । কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর মঞ্চে এল নতুন চরিত্র । জয়ার মা । জয়া তাঁর ছোটমেয়ের নাম । এছাড়াও এক ছেলে আর এক মেয়ে । বড়মেয়ে তরুণী – কিছুদিন পরেই বিবাহযোগ্যা হবে । তাই নিয়ে তাঁর যে দুশ্চিন্তার শেষ নেই, মায়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের টুকরোটাকরা কানে এলে বুঝতে পারতাম । বেশীদিন যেহেতু কাজ করেননি আমাদের বাড়ীতে, খুব অল্প কথাই মনে আছে ওঁদের সম্বন্ধে । শুধু একটা ঘটনা স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে । মেয়ের বিয়ের খরচ যোগাড় করতে না পেরে হাউহাউ করে কাঁদছিলেন একদিন । সেই দেখে আমার বাবা আশ্বাস দিলেন, অফিসে সহকর্মীদের বলে যতটা পারা যায় সাহায্য করবেন । করেওছিলেন । অফিস থেকে বেশ কিছু টাকা ওঠায় বিয়ের অনুষ্ঠানটা ভালয় ভালয় উতরে গিয়েছিল । বিয়েটা ছিল রবিবারে, সেদিন সকালে কনের মা এসে বাবাকে বললেন, 'দাদাবাবু, আপনিই এ বিয়ে দিচ্ছেন, আর আপনারা যাবেন না ? খোকাকে এখন নিয়ে যাই, আপনি আর মা পরে আসবেন' । বাবা-মা নানা কারণে রাজী না হওয়ায় 'খোকার' আর সেদিন বিয়ে দেখা হয়নি, কিন্তু আজও কোনো সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য ফান্ড্ রেইজিং করতে গেলে আমার প্রথমেই ওটার কথা মনে হয় ।

এর পরের কয়েক বছর আমাদের বাড়ীতে কাজের লোক এসেছে আর গেছে, কেউই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । তা সে বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই হোক, বা তাদের সকাল-সন্ধ্যে কাজে আসার সময়ের ব্যাপারে মায়ের উত্তরোত্তর অনড় মনোভাবের জন্যই হোক ।

অবাঙালী ব্যবসায়ীদের মোটা মানিব্যাগের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সরকারী চাকুরেরা ততদিনে কাজের লোকেদের কিছু বাড়তি সুযোগসুবিধা দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, যেমন কয়েক মাস অন্তর বেতনবৃদ্ধি আর পূজোর বোনাস । অনেক ফ্ল্যাটেই কয়লার উনুনের বদলে গ্যাসের (এল্ পি জি) উনুন আর বাটা মশলার বদলে প্যাকেটের গুঁড়োমশলা ঢুকে পড়ায় দৈনন্দিন কাজের বোঝাও কিছুটা হাল্কা হয়েছে ।

এই পর্বে যে নামগুলো মনে আসছে, তারা হল কল্পনাদি, আরতিদি আর শ্যামলীর মা । প্রথমজনকে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মা 'কমলা' বলে ডাকত । কল্পনাদি সকাল-বিকেল মিলিয়ে যতক্ষণ থাকত আমাদের বাড়ী, ওর মুখে কেবল একটা জিনিসই শুনতাম – হরেক রকম রান্নার রেসিপি । বাসন ধুতে ধুতে হয়তো পূর্ববঙ্গীয় কায়দায় কচুর শাক রাঁধার প্রণালী বলল, ঘর মুছতে মুছতে মোচার ঘন্ট আর বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে মেটেচচ্চড়ি । আর মাও ওর তালে বেশ ভালই তাল দিত, ক্রমাগত টুকটাক প্রশ্ন করে যেত যেন কত মনোযোগী শ্রোতা । আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে 'ওঃ, তোমরা রান্নার গল্প থামাবে ?' বললে কল্পনাদি নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিত, 'কেন গো, দুমুঠো খাওয়ার জন্যই তো সব' । এই দুমুঠো খাওয়াটা যে ও নিজের সংসারে সামান্য খিচুড়ি আর আলুভাতে-ভাত দিয়েই সারে, আর অন্যের সংসারে কাজ করার সময় ওর গোর্মে ক্যুলিনারি আর্টের কাল্পনিক জগতে ঘুরে বেড়ানোটা যে সেই অতৃপ্ত বাসনা থেকেই আসে, এটা হৃদয়ঙ্গম করলাম যখন – ততদিনে ও আমাদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে । কল্পনাদির সঙ্গে সকালে দেরী করে আসা নিয়ে মন কষাকষির ফলে মা যখন ওকে সাময়িকভাবে হারাল, ওর জায়গায় বহাল হল আরতিদি । আমার ছোটবেলার সেই জিনের মতো ওরও দুচার দিন অন্তর টাকা চাওয়ার অভ্যাস । আর সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ও কোন্ বাড়ীতে কোন্ দিন আগে যাবে, সে সিদ্ধান্ত ছিল ওর সম্পূর্ণ নিজের । ও-ব্যাপারে ওকে জোর করে, চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়ে বা রাগারাগি করে কোনো লাভ হতো না । অগ্রাধিকারের একটা অলিখিত নিয়ম মেনে চলত ও । আজ এবাড়ী আগে এলে কাল ওবাড়ী, পরশু তৃতীয় কোনো বাড়ী । আর সকালে যে বাড়ীতে আগে এসেছে, দুপুরে বা বিকেলে সেখানে আগে নয় । সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল এই ব্যবস্থা । তবে আমার যে কারণে ওকে সবচেয়ে বেশী মনে আছে, তা হল ওর ছেলের বন্ধুদের নাম । চ্যাংড়া, ট্যাংরা, আপেল আর বোকাতুল্লা (সম্ভবতঃ বরকতউল্লাহ্-র সংক্ষিপ্তকরণ) । প্রতিদিন ওর মুখে ঐ নামগুলো আর তাদের কান্ডকারখানা শুনে খুব একচোট হাসতাম।

বেশ কয়েকবার কল্পনাদি আর আরতিদিকে বহাল-বরখাস্তের পর দুজনের কাউকেই আর পাওয়ার সম্ভাবনা যখন রইল না, মা একদিন সকালে দেখলাম এক বয়স্ক, বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে কাজকর্ম আর মাইনেকড়ি নিয়ে কথা বলছে । পরদিন থেকেই আসতে শুরু করলেন তিনি । পাড়ায় চলতি নাম শ্যামলীর মা । দুই মেয়ে নিয়ে তাঁর অসচ্ছল সংসার – রূপালি আর শ্যামলী । প্রথমজনের বিয়ে দেবার পরেই স্বামী মারা যাওয়ায় অভাবের তাড়নায় আর ছোটমেয়ের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ী-বাড়ী ঠিকে কাজে নেমেছেন । মায়ের সঙ্গে অনেক সুখদুঃখের গল্প করতেন দেখতাম । কিন্তু আমি ততদিনে প্রাইমারী স্কুলের গন্ডী ছাড়িয়ে সেকেন্ডারী স্কুলে ঢুকেছি, দশটা থেকে পাঁচটা অবধি বাড়ীর বাইরে কাটে । তাই সেসব গল্পের খুঁটিনাটি তথ্য আমার স্মৃতির খাতায় লেখা নেই । তবে একটা তথ্য জেনে চমৎকৃত হয়েছিলাম । সারাদিনের অত কাজ সামলে তারপর আবার মা-মেয়ে খাটাল থেকে গোবর আর কয়লার দোকান থেকে কয়লার গুঁড়ো সংগ্রহ করে ঘুঁটে আর গুলের ব্যবসা করত । নিজেরাই বানাত আর শুকোতে দিত, তারপর নিজেরাই বিক্রি করত । তার সঙ্গে ছিল শীতকালে বড়ির ব্যবসা – নিজেরাই ডাল বেটে ভাজাবড়ি, ঝোলের বড়ি, হিংবড়ি এসব তৈরী করে দুপুরের মিঠে রোদে সারিসারি বেতের কুলোর ওপর থানকাপড় পেতে সাজিয়ে রাখত । কে বলে বাঙালীর ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেই, বা কোনোদিন ছিলনা ? গ্রামেগঞ্জে শহরে-নগরে এইসব অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে তার বীজ । শুধু বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের যে বিরাট অংশটা চাকুরিজীবী আর বুদ্ধিজীবী, তার কাছে কোনোদিন আন্তরিক মর্যাদা পেল না এগুলো । কেমন একটা নাক-সিঁটকানো তাচ্ছিল্যের ব্যাপারই রয়ে গেল ।

আমার মামাবাড়ী ছিল আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই । মিনিট দশ-পনেরোর হাঁটা । যেহেতু আমার বাবা-মা কর্মসূত্রে সারাদিনই বাড়ীর বাইরে, আমি ছোটবেলা থেকেই প্রতিদিন অনেকটা সময় কাটাতাম মামাবাড়ীতে । সেখানে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে কাজের লোক হয়ে এসেছেন-গেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হতোনা, কারণ স্কুল ছুটি হওয়ার পর দুপুর আর বিকেলের যে কয়েক ঘন্টা আমি ওখানে থাকতাম তখন তাঁরা আসতেন না । তা সত্ত্বেও একজনের কথা বেশ ভালই মনে আছে – ভারতীর মা । রোগা-রোগা চেহারা আর শক্ত চোয়ালের এই বিধবা ভদ্রমহিলার কথা ভাবলেই মনে আসে দুটো শব্দ – খরগোশ আর মিলন-দা । আসলে আমার মামাবাড়ীতে খাঁচায় রাখা

টিয়াপাখী ছাড়াও একটা সাদা ধবধবে খরগোশ ছিল অনেকদিন ধরে। এমনিতে সে নিজের মনেই ঘুরে বেড়াত, খিদে পেলে কলমি-শাক আর কপির ডাঁটা চিবোতে আসত। কিন্তু তাকে তো আর পেট্‌কো বা পেট্‌স্মার্ট থেকে লিটার বক্স আর পাপি-প্যাড্ কিনে এনে 'টয়লেট্ ট্রেনিং' দেওয়ার প্রশ্ন ছিলনা তখন। তাই সে কোথায় এবং কখন 'বাথরুম' যাবে, পুরোপুরি তার মর্জির ওপরেই ছাড়া থাকত সেটা। সুতরাং মাঝেমাঝেই দেখতাম ভারতীর মা যত্ন করে জলন্যাতা দিয়ে ঘরদোর মুছে যাওয়ার পরমুহূর্তেই খাটের তলার বাক্সপ্যাঁটরার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ঝাঁঝালো গন্ধওয়ালা তরলের স্রোত বা ঠাকুরঘরের মেঝেতে কালো কালো কিস্‌মিসের মতো টাটকা একরাশ বিষ্ঠা। সেই দেখে প্রচন্ড আক্রোশে শাপশাপান্ত করতে করতে তিনি খরগোশকে তাড়া করতেন আর আমরা ছোটরা দারুণ মজা পেতাম। কিন্তু ঘরটা তো আবার ওঁকে কষ্ট করে মুছতে হতো! যাইহোক, এঁর মেয়ে ভারতী তখন নাবালিকা হলেও বড় ছেলের বয়স ছিল কুড়ির ঘরে। সংসার চালানোর ব্যাপারে মায়ের বোঝা হাল্কা করার জন্য সে ধরেছিল একটা ছোটখাটো ব্যবসা। প্লাস্টিকের খেলনার। মামাবাড়ী থেকে আমাদের ফ্ল্যাটে ফেরার যে বড়রাস্তা, তারই একধারে ফুটপাথের ওপর পসরা সাজিয়ে বসত রোজ বিকেলে। আর প্রায় প্রতিদিনই মায়ের হাত ধরে বাড়ী ফেরার সময় আমি সেই মিলন-দার দোকানে দাঁড়িয়ে এটা ওটা কেনার বায়না করতাম। লিলিপুট পাখা, আলো-জ্বলা লাট্টু, ফ্লাইং সসার, রংবেরঙের মার্বেল – আমার ছেলেবেলার খেলাঘরের এইসব মহামূল্যবান রত্ন ছিল মিলন-দারই অবদান। আমি শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণের পরেও বেশ কিছুকাল চলেছিল দোকানটা। একদিন বিকেলে স্কুল-ফেরত বাস থেকে নেমে হঠাৎ দেখি দোকান উধাও! এরপর আরও কয়েকদিন গেল – রোজই উৎসুক চোখে তাকাই ফুটপাথের দিকে কিন্তু মিলনদা-র দেখা নেই। পরে মামাতো দাদা-দিদির কাছে শুনলাম ওর মা কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিয়েছেন, এলাকার কিছু তোলাবাজ গুন্ডা একদিন রাতে ওর দোকান তছনছ করে ওকে মারধোর করেছে, ও শয্যাশায়ী। ওঁদের পুরো পরিবারকেই শাসিয়ে গেছে, পাড়া ছাড়তে হবে। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক রংমাখানো কোনো গন্ডগোলের জের। 'কালার-কোডেড্' রাজনীতিতে রং বাছতে ভুল করলে তো আর রক্ষা নেই। ব্যস্, বন্ধ হয়ে গেল ওঁর আমার মামাবাড়ীতে আসা। শুধু স্মৃতি হয়ে রইল সেই খেলনাগুলো।

আরেকজনের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই স্মৃতিচারণ। আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার বছরকয়েক আগে, রেখার মা বলে একজন বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন আমাদের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে আসত ওঁর কিশোরী মেয়ে আর তার ছোট্ট একটা ভাই। রেখাদি আমার চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের বড়, কিন্তু আমাদের বাড়ীর কাজকর্মের আদ্ধেকটাই সামলাত ও। আর দীনু, মানে ওর ভাইটা, ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে স্কুলের পড়া করত। হ্যাঁ, এই প্রথম আমাদের বাড়ীতে কাজ করতে আসা কাউকে দেখলাম ছেলেকে স্কুলে পাঠায়। মাঝেমাঝেই টুকটাক খাতা-পেন্সিল রাবার-টাবার দিয়ে আমরাও চেষ্টা করতাম ওকে উৎসাহিত করার। প্রায় বছর দেড়েক এভাবে চলার পর সম্ভবতঃ ওদের মার অসুস্থতার কারণে একসময় ওদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল ওদের কথা। বছর দুই বাদে আমার হায়ার সেকেন্ডারীর প্রিটেস্ট পরীক্ষা যখন আসন্ন, হঠাৎ একদিন সকালে বাজার থেকে বাড়ী ফিরে দেখি ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে এক তরুণী। চেনাচেনা মুখ। কোলে আবার একটা ছেলে। প্রথমে ঠিক চিনতে না পারলেও কয়েক মুহূর্ত পরেই খেয়াল হল, আরেঃ, এ রেখাদি না? এই দুবছরে চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে, মুখেও কঠিন জীবন-সংগ্রামের ছাপ। কাজের খোঁজে এসেছে পুরোনো জায়গায়। সেইসময় কয়েক মাস আমাদের বাড়ীতে কোনো কাজের লোক ছিল না। খুব ভোরবেলা উঠে যাবতীয় সাংসারিক কাজ আর রান্নাবান্না সামলে তাড়াহুড়ো করে দশটার বাসটা ধরতে ছুটত মা, নাহলে স্কুলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে। রেখাদি আসায় যেন হাতে চাঁদ পেল। কিন্তু এ তো আর আগের রেখাদি নয়, এর যে বছরখানেকের একটা কাঁদুনে ছেলে রয়েছে। তাকে সামলে কাজ করা কি চাট্টিখানি কথা? তাকে ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে করিডোরে বসিয়ে রেখে ও ভেতরে কাজ করলে সে সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে তারস্বরে কাঁদে, আবার তাকে ফ্ল্যাটের ভেতরে রেখে কাজ করলে সে তার মাকে দেখতে পেয়ে কোলে ওঠার জন্য চিল চিৎকার করে। এরকম করতে করতে কাজের দেরী হয়ে যেত রোজ। আমার মায়ের যেহেতু সকালে সবকিছু একদম সময়-বাঁধা, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে তাড়া লাগাত। তখন রেখাদি মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করে 'বাচ্চালিয়ে হাচ্চালিয়ে কাচ্চালিয়ে' ইত্যাদি কীসব বলত, ঠিক বুঝতে পারতাম না। এখন বুঝতে পারি ও বলতে চাইত, বাচ্চা নিয়ে হাত চালিয়ে কাজ

চালিয়ে যাওয়া কি সোজা ? যাইহোক, একদিন কোনো কারণে ওর মনমেজাজ হয়তো একটু বেশীই খারাপ ছিল। মায়ের বিরক্তি দেখে আর রাগ সামলাতে না পেরে ঐ একরত্তি ছেলেটাকে এমন মার মারল, আমি পড়া ছেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেও সামলাতে পারলাম না। মায়ের প্রাণ তো, অত মারধোরের পর সারাক্ষণ কাজ করতে করতে চোখের জল ফেলল। আর মুখে অসহায় শাপশাপান্ত – 'অলক্ষুণে, বাপেখেদানো ছেলে, তুই মরিস না কেন ?'

পরে জেনেছিলাম রেখাদির সেদিনের সেই কথাগুলোর কারণ। দুবছর আগে ওর মায়ের অসুস্থতার দরুণ শুধু আমাদের বাড়ীর না, সব বাড়ীর কাজই চলে গিয়েছিল ওদের। ঐ বয়সে একা দুবেলা ঠিকে কাজ করে মায়ের ওষুধবিষুধ, ভাইয়ের পড়াশোনা আর তিনটে প্রাণীর ভরণপোষণ চালানোর ক্ষমতা ছিলনা ওর। সুতরাং জীবন-নাট্যমঞ্চের চিরকালীন নাটকে এই ধরণের পরিস্থিতিতে যা হয়, ওরও তাই হল। যে বস্তিতে থাকত, সেখানকার এক দুশ্চরিত্র ছেলের পাল্লায় পড়ল ও। তার ফলে এই সন্তান, যার জন্মের আগেই বাবা যথারীতি সব দায়িত্ব অস্বীকার করে পালায় আর জন্মের ঠিক পরেই দিদিমার (অর্থাৎ রেখাদির মায়ের) মৃত্যু হয়। সেদিনের সেই মারধোরের ঘটনার পর রেখাদি যে জিনিসটা করা শুরু করল, সেটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম কিছুদিন পরে, কারণ সকালে ঐ সময়টায় বন্ধুদের সঙ্গে একজন টিউটরের কাছে পড়তে যাওয়ার ব্যাপার ছিল। একদিন ট্যুইশন থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি আমাদের ফ্ল্যাট যে বিল্ডিং-এর দোতলায়, তারই একতলায় সিঁড়ির নীচে ধূলোর মধ্যে বসে রয়েছে ছেলেটা আর ওর একটা পা দড়ি দিয়ে থামের সঙ্গে বাঁধা। ক্রমাগত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে ও, সে-শব্দ দোতলায় পৌঁছচ্ছে না বলে সবাই বোধহয় ভাবছে ঠিক আছে সবকিছু। আর থাকতে পারিনি সেদিন, চোখে জল এসে গিয়েছিল। ছুটে গিয়ে বলেছিলাম মা-বাবাকে, 'এ জিনিস বন্ধ কর কোনোভাবে, নাহলে আমাকে সকালের ট্যুইশনের সময় বদলাতে হবে'। মা ব্যাপারটা জানতে পেরে বিচলিত হয়ে রেখাদিকে বলল তক্ষুণি ওকে ওপরে আনতে। আর আমি আমার ছোটবেলার জমে থাকা খেলনার স্টক থেকে যা যা পারলাম বার করে দিলাম। তারপর থেকে এটাই হয়ে গেল নিয়ম – আমি ট্যুইশনে যাবার আগে ওর জন্য কয়েকটা খেলনা বার করে রেখে যাব আর ও ফ্ল্যাটের মধ্যেই সেগুলো নিয়ে ভুলে থাকবে। আফসোস হচ্ছিল আমার – এই উপায়টা আরো কদিন আগে মাথায় এলনা ! এভাবেই আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে ভাব জমে গেল ওর, কান্নাকাটি আর করতনা। বাবাকে বলত 'দাবু' (দাদু) আর আমাকে 'নামা' (মামা)। কিন্তু মাকে রেখাদির দেখাদেখি 'মাচি' (মাসী) বলেই ডাকত।

এমনি করেই একদিন আঠেরো ছুঁলাম আমি। বাড়ী ছাড়লাম কলেজের হোস্টেলে থাকব বলে। পিছনে ফেলে এলাম এমনতরো নানারঙের সব গল্প। কিন্তু শৈশব ও কৈশোর নামক ছোট ছোট দীঘির চেনা ঘাট পেরিয়ে জীবনের মহাসমুদ্রে পড়ে দেখলাম গল্পের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, আর তার সঙ্গে দেখা-শোনার ধরণটাও বদলে গেছে। জীবনকে রূঢ় বাস্তবতার আতসকাঁচে ফেলে তার গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা জন্মাচ্ছে আস্তে আস্তে। জাগছে প্রশ্ন, বাড়ছে অনুসন্ধিৎসা। নিত্যনতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে চোখের সামনে, উপলব্ধি করছি এমন অনেক কিছু যা আগে কখনো ভেবে দেখিনি। বুঝতে পারছি, হোস্টেলের হেঁশেলে ফাইফরমাশ খাটা বেঁটেখাটো চেহারার যে লোকটা মাঝেমাঝেই চোখ লাল করে কাঁদতে কাঁদতে 'বৌয়ের আসুখ' বা 'ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট' বলে ছাত্রদের কাছে টাকা ধার নেয় আর বছর ঘুরে গেলেও শোধ করেনা, সে-টাকা তার ছেলে-বৌয়ের কাজে লাগে না আদৌ – যায় তার নেশার গর্ভে। তার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি কোনো এক 'ভোলার বাবার', যার সকাল দশটায় ইঁটভাটায় গিয়ে দিনমজুরি জুটলেও তার বৌ-ছেলে-মেয়েকে না খেয়ে থাকতে হয়, কারণ মাইনেটা যায় দিশি মদের বোতলে। আমি প্রথম বিদেশ পাড়ি দেওয়ার দিন এয়ারপোর্টের গেটের মুখে যে প্রতিবন্ধী ছেলেটি মলিন পোশাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে আমার ভারী স্যুটকেসটা ট্রলিতে তুলে দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের জন্য, সেও হয়তো একদিন ছিল কোনো 'মিলন-দা' – রঙীন খেলনার পসরা সাজিয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাত। রাজনীতির রং বাছতে ভুল করেছিল বলেই হয়তো আজ এই দশা। শুধু কি ওরা ? বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পাচারকারীরা যে মেয়েটিকে 'পরিচারিকার' চাকরি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাঠিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে যৌনদাসী হতে, তার কোলেও আজ অবৈধ সন্তান। প্রতিদিন সে যখন তার 'কাজ' করে, হয়তো সেই সন্তানটিও দড়ি দিয়ে থামে বাঁধা থাকে। আর

মেক্সিকোর সন্ত্রাসজর্জরিত, মাদকসম্পৃক্ত অরাজকতা আর দারিদ্র থেকে পালিয়ে একটু ভালভাবে বাঁচার আশায় যে অসহায় মানুষগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দলে দলে বেআইনী অনুপ্রবেশ করে তাদের উত্তরের প্রতিবেশী দেশটিতে, তাদের সঙ্গেই বা পারুলদি আর জিনের তফাৎ কোথায় ? ওরাও তো একদিন সেই একই তাড়নায়, সেই একই আশা বুকে নিয়ে খুলনা, রংপুর বা রাজশাহী থেকে নিজেদের সবকিছু ছেড়েছুড়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সপরিবারে চলে এসেছিল পশ্চিমে । দুটো সীমান্তেই কাঁটাতারের বেড়া আছে, আছে সশস্ত্র প্রহরী । কিন্তু ওদের ঠেকানো যায়নি । তাই যখন শুনি দুর্ভেদ্য দেওয়াল তোলা হবে এবার সীমানা বরাবর – হাসি পায় ।

দেওয়াল তুলে কি খিদে আটকানো যায় কখনো ?

নানা স্বাদের লেখা

আমার পুজো, ওদের পুজো

সৈকত দে, আগরতলা, ইন্ডিয়া

এই লেখা যখন লিখছি তখন দুর্গাপুজো সমাগত প্রায়। আকাশে শরতের ছাড়া ছাড়া মেঘের আনোগোনা। উত্তরপূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে যদিও এখনও বেজায় ভ্যাপসা গরম বাতাসে আর্দ্রতার দরুন শরীর ঘর্মাক্ত। কবির কল্পনার 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' এখনও গায়ে লাগে নি। তবুও শরৎকাল বলে কথা। বাঙালির নাকে পুজো পুজো গন্ধ। ভোরের বাগানে ঝরে পড়া শিউলি ফুল। তাতে কি শিশির লেগে থাকে ? দেখা হয়ে ওঠে না আজকাল। কাশফুলের মাঠ দেখা গেল ট্রেনে যেতে যেতে রেললাইনের পাশে। অপু দুর্গা ট্রেন দেখতে কাশফুলের মাঠ ধরেই দৌড়েছিল না ? বড় হতে কি পুজোটাকেও বিসর্জন দিলাম ? ছেলেবেলায় আমার পুজো শুরু হয়ে যেত মাসখানেক আগেই। আসামের ছোট এক শহরতলিতে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। স্কুল থেকে ফেরার পথে কুমোর পাড়া। প্রতিমার কাঠামো তৈরি হচ্ছে সেখানে। কাঠ বাঁশের কাঠামোয় খড়ের অবয়ব। তাতে পাটের দড়ি বেঁধে আকার নিচ্ছে মাতৃমূর্তি। কাঁচা মাটির প্রলেপ পড়ছে। রোদে শুকিয়ে কঠিন হচ্ছে। বৃষ্টি হলে বার্নার জ্বালিয়ে শুকোনো হচ্ছে। আস্তে আস্তে আকার ধারণ করছেন মৃন্ময়ী মা। কি সুন্দর তাঁর হাত পা মুখ। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতাম সব বন্ধু মিলে। ভুলে যেতাম বাড়ি ফিরে খাবার খিদে। মহিষাসুরের পেশীবহুল শরীরের সিক্স প্যাক অ্যাব দেখে আরও বিস্ময়। শুকিয়ে গেলে মায়ের গায়ে রঙের প্রলেপ পড়বে। একে একে আঁকা হবে নাক কান করতলের রেখা। সবচেয়ে অবাক বিস্ময় ছিল ঠাকুরের চক্ষুদান। চোখ আঁকা হতেই যেন মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপ ধারণ করলেন। শাড়ি পরে অস্ত্র শস্ত্র সহযোগে মহিষাসুর মর্দিনী রূপে সিংহ বাহিনী। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস আর রোমাঞ্চ নিয়ে সেই ছোট্ট আমি টার জীবনে পুজো আসত।

একই সঙ্গে পুজো আসত সত্য-দা'র জীবনেও। কুমোর পাড়ার সত্য রুদ্রপাল। যার হাতে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপ ধারণ করতেন। আমরা যখন পুজোর কেনাকাটা নিয়ে মত্ত তখন সত্য-দা একমনে মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। গভীর রাত অব্দি আলো জ্বলত সেখানে। দিনরাত সত্য-দা আর তাঁর সঙ্গীরা প্রতিমা গড়ে চলছেন। যেন নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই। কত রকমের কত প্রতিমা। কত রকমের অর্ডার। পছন্দ না হলে বারোয়ারীর বাবুদের গোসা। বায়নার টাকা পুরো দেয় না। কিন্তু প্রতিমা সুন্দর হলেও তো কেউ জিজ্ঞেস করে না কার হাতে গড়া। তবুও কটা টাকা আসে সত্য-দা'র রোজকারের অনটনের সংসারে। অষ্টমী-নবমীর গভীর রাতে যখন অনেক ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরতাম, তখনও সত্য-দা'র কর্মশালায় আলো জ্বলে। ব্যস্ত সত্য-দা গড়ে চলেছেন প্রতিমা। আর দিন পাঁচেক পরেই যে আসছেন মা লক্ষ্মী। দুর্গা পুজো দেখার সময় কই সত্য-দা'র ?

ষষ্ঠীর বোধনে ঢাকে কাঠি পড়ল আর শুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস। দূর থেকে ঢাকের বাদ্যি বাজনা কানে আসলেই মন ছুটে যেত প্যান্ডালে। শহরের বিভিন্ন পুজোয় ঢাক বাজাতেন প্রায় বৃদ্ধ অনিল বাবু। আমরা বড় হতে হতে তিনি অশক্ত হলেন। তাঁর জায়গা নিল ছেলে নরেন। খুব ভাল বাজাত। বছরের বাকি সময়টা চাষ-বাস করত। সে বছর নরেনের বিয়ে হল। ভাবলাম এবার বুঝি নরেন আর বাজাবে না। ষষ্ঠীর বোধনে ঢাক হাতে নরেনকে দেখে বেশ অবাক হলাম। চেপে ধরলাম ওকে। এবারও ঢাক ? নরেন বলে গেল তার কাহিনী –

এবছর বৃষ্টি ভালই হল। ফসলও মন্দ হয় নি। সাহস করে নরেন আরো দুটো জমি বর্গা নিয়েছিল। অর্ধেক মালিক কে দিতে হবে। তা দিলেও মোটামুটি বেশ কিছু পেয়ে যাবে নরেন। তবুও কাল ঢাকটা একটু টান করতে বসতেই শম্পা বলল – 'হ্যাঁ গো, এবার কি শহরে না গেলেই নয় ?' কি বলবে নরেন ? বাপ ঠাকুরদার পেশা কি অসম্মান করা যায় ! একবছরও বিয়ে হয় নি, তাও পুজো তে শম্পা কে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে যেতে হবে শহরে। যেতে কি ওরও ইচ্ছে হয় ! সকালে দুটো চিড়ে মুড়ি পোঁটলায় বেঁধে বাসের ওপরে ঢাক চাপিয়ে ৫ ঘন্টার রাস্তা শহর। সেখানে গিয়ে আবার ঢাকিদের লাইন। বারোয়ারীর বাবুরা এসে বাজাতে শুনবেন, দাম দর করে বুক করবেন। পুজোর চারদিন সমানে ঢাক বাজানো। দুপুরে রাতে খিচুড়ি। মাঝে দয়া হলে একটু ভোগের চাল মুলো মিষ্টি। দশমীর দুপুরে ট্রাকে ঠাকুর যাবেন, সঙ্গে যাবে ইয়া ইয়া সাউন্ড বক্স। সেই গান বাজছে বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঢাকির থামার উপায় নেই। বাবুদের নাচের

সঙ্গে হেঁটে যেতে হবে । হেঁটে হেঁটে কাঁধে ঢাক ঝুলিয়ে সমানে বাজানো । হাত ব্যথা করে, শরীর ভেঙ্গে আসে । থামলেই বাবুদের চীৎকার ধমক – 'এই ব্যাটা, থামলি কেন, বাজা বাজা !' শরীরের রক্ত জল হয়ে বেরোয় । এবার তার সঙ্গে মিশবে শম্পার চোখের জল । তবুও তো দুটো পয়সা আসে । এই সেদিন রায় বাবুর দোকান থেকে শম্পাকে লুকিয়ে যে শাড়িটা এনেছিলে নরেন, সেটার টাকা শোধ হয়ে যাবে । শাড়ি পেয়ে শম্পার চোখের খুশীর ঝিলিকের জন্য এটুকু কি আর কষ্ট । প্যান্ড্যালে রাতে মশার কামড়ে যখন ঘুম আসে না, বিসর্জনের পর যখন শরীরটা ছেড়ে দেয়, শুধু ওইটুকুই তো সাথে থেকে যায় । ঢাকের চামড়ার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে নরেন ভাবে – পুজো আসছে ।

পুজো আসে অনিমা-দি'র জীবনেও । বর কারখানায় কাজ করে যা রোজগার করে, তাতে চারটে পেট চলে না । তাই অনিমা-দি কেও উপায় করতে হয় । করতে হয় লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ । বাকি কটা ছোট খাটো হলেও ঘোষাল বাড়ির কাজ বড় । মাইনেও বেশি । ঘোষালদের একান্নবর্তী পরিবার । প্রতিবেলা ১৫/২০ টা পাত পড়ে । গিন্নিমার একটাই শর্ত – পুজোয় কিছুতেই ছুটি করা চলবে না । তখন ঘোষালদের অনেক আত্মীয় স্বজন, বাইরে পড়তে যাওয়া বা চাকরি করা পরিবারের সদস্য সব পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসে । রোজ তিন বেলা ২৫/৩০ জনের রান্না । কোন বার আরো বেশিও হয় । তার ওপর দফায় দফায় চা-জলখাবার । সকাল থেকে রাত ঘোষালদের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই পুজো আসে, চলে যায় । বাচ্চাদের নিয়ে ঠাকুর দেখা হয় না । বাচ্চাগুলো আগে খুব কান্নাকাটি করত । এখন মানিয়ে নিয়েছে । ঘোষাল গিন্নী রোজ অনেক খাবার দিয়ে দেন অনিমার আর বাচ্চাদের জন্য । বাচ্চারা মুখিয়ে থাকে সেই সব মহার্ঘ্য স্বাদু সুস্বাদু খাবার চাখার লোভে । তা ছাড়া প্রায় দ্বিগুণ মাইনেও পাওয়া যায় । সঙ্গে শাড়ী কাপড় তো অবশ্যই । বেড়াতে আসা আত্মীয় স্বজনারও ফিরে যাবার সময় এটা সেটা দিয়ে যান । সঙ্গে হাতে গুঁজে দেন কিছু বখশিস । এ যে অনেক পাওনা । সেটার জন্য দুর্গা ঠাকুরকে না হয় নাই দেখা হল ঘুরে ঘুরে । বাচ্চাগুলোর শুকনো মুখে চারটে ভালমন্দ তুলে দিতেই অনিমা-দি'র আনন্দ । দিনের শেষে যখন বাচ্চাগুলো হামলে পরে পেট পুরে খায়, অনিমা-দি'র চোখ ভরে ওঠে । কিছু কান্না কিছু খুশি নিয়ে আবারও পুজো আসে অনিমা-দি'র জীবনে ।

আর এই খাবার নিয়েই পুজো আসে শঙ্করের । শহরের বড় রেস্তোরাঁর ওয়েটার শঙ্কর । এমনিতেই এই রেস্তোরাঁর বেশ নাম ডাক । তার ওপর পুজো এলে তো কথাই নেই । সময় পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার । বাঙালি পুজো দেখতে বেরোবে আর বাইরে খাবে না, তা কি হয় ! তাই খুব ভিড় লেগে থাকে সারাদিন । রেস্তোরাঁও খোলা । পুরো দিন এবং রাত তিনটে অব্দি । ঝন্ ঝন্ টুং টাং প্লেট ডিশ চামচের ঠোকাঠুকি । গরম খাবারের অর্ডার । শঙ্করের দম ফেলার ফুরসত নেই । ক্লান্তি গ্রাস করলেও বসার জো নেই । বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে দেখতে হয় শঙ্করের । তাই পুজোর কটা দিনের কিছু বাড়তি টাকা খুব উপকারে আসে । আর তার থেকেও বড় আশা টিপস পাবার । প্রতি বিলের সঙ্গেই ভাল টিপস পাওয়া যায় । মালিক বোনাসও দেন । সেই সব মিলিয়ে কিছু বাড়তি রোজগারের লোভ সামলানো যায় না । সবাইকে কাপড় জামা কিনে দিতে হলে এই টাকা যে খুবই দরকার । তাই দুর্গা মা মণ্ডপে থাকলেও শঙ্করের সময় নেই দেখা করার । কাজের মধ্যেই পেন্নাম ঠুকে মনে মনে । দিনের শেষে রকমারি খাবারের সারাদিনের গন্ধে কখনও গা গুলিয়ে ওঠে । কিছু খেতে ইচ্ছে করে না । তাও জোর করে দুটো গিলতে হয় । নইলে পরদিন লড়বে কি করে । কষ্ট আর টাকা মিলেমিশে শঙ্করের পুজো বাবুদের প্লেটে গড়াগড়ি খায় ।

এই করেই পুজো আসে পুজো যায় সত্য-দা, নরেন, অনিমা-দি, শঙ্করের জীবনে । সেই সঙ্গে পুজো আসে যায় সারারাত ট্রাফিক সিগন্যাল সামলানো ট্রাফিক কনস্টেবল রমেশ বাবুর, রাস্তার কোনায় অন্ধকারে মুখে রঙ মেখে দাঁড়ানো দেহোপজীবিনী চুমকির, বড় পুজোর মণ্ডপের পাশে রোল-চাউমিনের স্টল দেয়া মিঠুনের । দুটো বাড়তি টাকার হাতছানি দিয়ে পুজো আসে পুজো যায় । জীবন বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে পুজো আসে পুজো যায় । সত্যি কি কোনদিন কিছু বদলায় ? না বদলাক, তবুও দিন বদলের স্বপ্নটাই তো কত সুখের । তাই বিজয়ার ঢাকের শব্দে মন থেকে বেরিয়ে আসে সেই আশা – আবার এসো মা ।

সৈকত দে ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগে কর্মরত প্রযুক্তিবিদ । পৈতৃক নিবাস উত্তরপূর্ব ভারতে অসমের তিনসুকিয়াতে । ছেলেবেলায় কাঁচা হাতের লেখায় 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' 'শিশু প্রতিভা' খেতাবে পুরস্কৃত হয়ে লেখালেখির ভূত মাথায় চেপে বসে । কর্মজীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের টানাপোড়েনে কোনটাতেই সম্পূর্ণ সমর্পণ করা আর হয়ে ওঠে না । তাও প্রকাশিত অপ্রকাশিত রচনার সম্ভার নিয়ে এক অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যপ্রেমী হয়ে থাকতেই স্বচ্ছন্দ ।

নানা স্বাদের লেখা

মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা

নন্দিনী নাগ সারকার, কলকাতা, ইন্ডিয়া

১৯৯২ সাল, আমরা সবে পাহাড় থেকে সমতলে এসে বাসা বেঁধেছি । আমাকে নতুন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে । সেখানে আমার নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে হত । কারণ আমার ছোট জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস ওদের থেকে একটু আলাদা । ওপার বাংলা থেকে আমার পরিবার সোজা কলকাতায় আসেনি । আমরা উত্তরপূর্ব রাজ্যের অবাঞ্ছিত বাসিন্দা যারা শান্তির আশ্রয় খুঁজতে কলকাতায় এসেছি । অন্তত আমার তাই পরিচয় । কারণ আমার জন্ম শিলং-এ । ''শিলং কী আসাম-এ ?'' এই প্রশ্ন জীবনে আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে ।

এখনও মনে আছে, স্কুলে আমি খুব কম কথা বলতাম, কারণ আমার ভাষা ছিল অন্য সবার থেকে আলাদা । একদিন ''পেটে ব্যথা'' বলতে গিয়ে বলেছিলাম ''প্যাটে ব্যথা'' । উচ্চারণের ব্যবধানেই ধরা পড়েছিল আমার ভিন্নতা । যতদূর মনে পড়ে কয়েকজন আমার ভুল উচ্চারণের জন্য হেসেছিল । ওদের মধ্যে কেউ একজন বলেছিল - ''তোরা কী অসমিয়া ?'' আমি তো নিজেকে বাঙালী বলেই জানতাম । খুব মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে সবাইকে একবার করে ''পেট'' উচ্চারণ করতে বলেছিলাম । আমাদের বাড়িতে ''পেট'' কে ''প্যাট'' বলাটাই তো স্বাভাবিক ।

''তাহলে কলকাতায় কি বলে ?''

উত্তর পেলাম ''ওরা পেট বলে'' ।

''সেটাই তো, আমি তো ''প'' বলেছি, ''ফ'' না । তবুও কেন ওরা হাসলো ?''

এর কোন উত্তর ছিল না বড়দের কাছে ।

কি অদ্ভুত, এই বাংলা ভাষার সামান্য রকমফের । হঠাৎ করে নিজের ভাষাগত পরিচয় হারিয়ে গেল । তারপর থেকে আমি নিজের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে খুবই সচেতন হয়ে পড়ি । বাংলায় যতটা সম্ভব কম কথা বলতাম । নিজের ভাষার পরিবর্তে আমি অন্য ভাষায় ভাবতে আর নিজেকে ব্যক্ত করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম । সেই এক ভয় - যদি আবার কেউ হেসে আমার বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ।

বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সচেতনতা হয়ত কমে গিয়েছে । বা এটাও হতে পারে যে নিজের অদ্ভুত উচ্চারণ নিয়ে লজ্জাবোধ কমে গিয়েছে । আমাকে হিন্দিতে কথা বলতে যাঁরা শোনেন তাঁরা অনেকেই অবাক হয়ে যান যখন বলি আমি বাঙালি । তখন সড়গড় বাংলায় কথা বলি, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমার প্রথম ভাষা বাংলা । ওই ভাষার হাত ধরেই নিজের শিশু মনের ভাব ব্যক্ত করতে শিখেছিলাম । যদিও এখনও ''পেট'' কে মাঝে মধ্যেই ''প্যাট'' বলে ফেলি । হলই বা গণ্ডগোলে, তবুও আমার মজ্জাগত ভাষা তো বাংলাই । ছেলেকে আদর করার সময় তাই ''ডার্লিং'' বা ''বেবি'' বেরোয় না মুখ দিয়ে, ''ময়না পাখী'', ''সোনা বাবা'', এগুলোই মাতৃ মনের সাবলীল আন্তরিকতা প্রকাশ করে ।

এটাই বোধহয় মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা ।

নন্দিনী ঋদ্ধান্শ । পেশাগত আর নেশাগত ভাবে শব্দের জগতের বাসিন্দা । স্বভাবে বোহেমিয়ান । কখনো মাছ হয়ে গভীর জলের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় আবার কখনো পাখী মনের ডানা মেলে নীল আকাশের দিকে ছুটে যায় । নিজের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজা প্রধান লক্ষ্য । ভালোবেসে অন্যদের বলা গল্প আর বৃষ্টির গান শুনতে । জন্মস্থান শিলং, বর্তমান নিবাস কলকাতা, কর্মভূমি মানব মন ।

নানা স্বাদের লেখা

কলকাতার প্রথম মিষ্টি মল্

বিশাখা দত্ত, কলকাতা, ইন্ডিয়া

‘মল্’ বলতেই আমরা বুঝি পাঁচতলা বাড়িতে এক ছাদের তলায় হরেক রকম ‘ব্র্যান্ডের’ সমাহার। কলকাতায় এতদিন পর্যন্ত কিন্তু মল্ বলতে ‘শপিংমল’ বোঝাত, তাতে শুধু দৈনন্দিন সামগ্রী থেকে শুরু করে পোশাক অবধি পাওয়া যায়। আর পেট পুজোকে বাদ দিলে তো ঘোরা নৈব নৈব চ !

আচ্ছা যদি এমনটা হত এই পাঁচতলা মল্ শুধুই মিষ্টির। না না, এ কোনো ভূতের রাজার বর নয়, খোদ কলকাতার বুকে এবার ছ’তলা ‘মিষ্টি মল্’ খুলতে চলেছে বলরাম মল্লিক।

ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারের পাশেই ২নং পদ্মপুকুর রোডে তাদের আদি দোকান ঘিরে নির্মাণ চলছে প্রাসাদোপম এই ছ’তলা মিষ্টি বিপণির। সারা পৃথিবী থেকে আসা পর্যটকদের কাছে এ হবে এক অনন্য আকর্ষণ।

১৮৮৫ সালে গণেশ চন্দ্র মল্লিকের হাত ধরে এই দোকানের যাত্রাপথ শুরু। কোন্নগরের বাসিন্দা গণেশ চন্দ্র মল্লিক কাজ শুরু করেন উত্তর কলকাতার একটি মিষ্টির দোকানে। সেখান থেকেই নিজস্ব দোকান খোলার তাগিদে ভবানীপুরে জমি কিনে ব্যবসা শুরু করেন। ‘‘গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডার’’ নামে শুরু হলেও পরে তা আত্মপ্রকাশ করে ‘‘বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক’’ নামে।

এরপর ধীরে ধীরে বড় হয়েছে দোকান। বেড়েছে মিষ্টির পসার। সাবেকীয়ানা বজায় রেখে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু অনেক আগেই।

বলরাম মল্লিকের বর্তমান কর্ণধার সুদীপ মল্লিকের মতে বহুদিন ধরে মিষ্টির কোন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছিল না। তাই সেই জায়গায় অভিনবত্ব আনতে এই অদ্বিতীয় প্রচেষ্টা। মল্ তো হল। কিন্তু কী কী পাওয়া যাবে এই মলে ?

ছ’তলা মলে এক-একটি তল সাজবে এক-এক ধরনের মিষ্টিতে, সাধারণ মানুষের জন্য থাকবে একটি টিকিটের

বিনিময়ে সরাসরি মিষ্টি তৈরীর পদ্ধতি দেখার সুযোগ। সুদীপ বাবুর কথা অনুযায়ী প্রথম তলে হবে প্যাকেজিং, দ্বিতীয় তলে থাকবে মুখোরোচক নোনতা খাবার। তৃতীয় তলে বেকারি, চতুর্থ তলে মিষ্টি, আর সবশেষে অর্থাৎ পঞ্চম তলে থাকবে দই ও রাবড়ি।

এখানেই শেষ নয়, থাকছে অভিনব ‘‘রাবড়ি যন্ত্র’’। যন্ত্রের সাহায্যে রাবড়ি তৈরীর পদ্ধতি আনছেন সুদীপ মল্লিক। স্বাদ অভিনব রেখে শ্রম বাঁচাবার তাগিদে এই পরিকল্পনা করেন তিনি। যাতে অতি অল্প সময়ে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। আরো জানা যায়, দোতালার বেশীটা জুড়ে থাকবে ‘ডিসপ্লে’ বা প্রদর্শনী। বাংলার মিষ্টির ইতিহাস থাকবে সেখানে। কিভাবে, কোথায়, কখন বাংলার ছানার ব্যবহার শুরু হল, সন্দেশ তৈরী হল, কালীঘাট মন্দিরে তা কি ভাবে মায়ের কাছে প্রথম নিবেদন করা হল, কীভাবে বাংলায় প্রথম তৈরী হল রসগোল্লা, ওড়িশার লাল রসগোল্লা বাংলার সাদা রসগোল্লার আগে না পরে এই সবই বিবৃত হবে সবিস্তারে। থাকবে বলরাম মল্লিক রাধারমণ মল্লিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসও।

সত্যি বলতে কি, শুধু দই যে কতরকমের হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু এই মলে পাওয়া যাবে ভাপা দই, সরের দই, ক্ষীরের দই, আম দই ইত্যাদি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় পয়োধি। এইসব উদ্ভাবনীর মাঝে কিন্তু সাবেকী মিষ্টি বাদ যাবে না। 'ভাইফোঁটা', 'ফুলশয্যা' ছাপানো মিষ্টি, রসগোল্লাও মানুষ পাবেন।

মিষ্টি মল্ প্রসঙ্গে সুদীপ বাবু বলেন, ''চেষ্টা করছি যাতে বাড়ির স্থাপত্য থেকেই বাংলার মিষ্টির ইতিহাসের এই আধুনিক পর্বের সময় সারণির একটা আভাস পাওয়া যায়।'' উনিশ শতকের ধনী বাঙালীর বাড়িতে যে সব ইউরোপিয়ান স্থাপত্য চিহ্ন ছিল প্রায় আবশ্যিক, নুতন বিপনির থামে, কার্নিশে, খিলানে সে সব ধরার চেষ্টা থাকবে।

আগেই জানিয়েছি যে ''live'' মিষ্টি তৈরী দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন বলরাম মল্লিক, তবে এর সাথেও থাকছে ''লাইভ কিচেন ফর ন্যাচারাল আইসক্রিম'' দেখা যাবে। কী ভাবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরী হচ্ছে আইসক্রিম, যেমন ম্যাঙ্গো আইসক্রিম তৈরী হবে হিমসাগর বা ল্যাংড়া আমের টুকরো আর রস থেকে। আমের গন্ধ ঢেলে নয়। ''লেমন আইসক্রিম'' চাইলে খাঁটি গন্ধরাজ লেবুর স্বাদই পাওয়া যাবে।

তবে শুধুই কি কলকাতাবাসীর কপালে জুটবে এই অমৃতভান্ডার নাকি কলকাতার বাইরেও প্রতিষ্ঠান খোলার কথা ভাবছেন তারা ? কলকাতার বাইরে এখনো শাখা খোলার কথা ভাবছেন না, তবে খুললেও একেবারে সুদূর বিদেশে খোলার কথা ভাবছেন। দিল্লী, লন্ডন, নিউ ইয়র্কেও বলরাম মল্লিক-এর দোকান খোলার কথা ভাবছেন সুদীপ মল্লিক। এখন অপেক্ষা শুধুই কলকাতার বিস্ময়কর এই মিষ্টি মলের উদ্বোধনের।

Editorial

"Sometimes our fate resembles a fruit tree in winter. Who would think that those branches would turn green again and blossom, but we hope it, we know it."

Johann Wolfgang von Goethe

The winter season brings cold and darkness but also some of the brightest holidays and warmest hopes for life's renewal. This month's English pieces highlight the hidden connections between winter holidays in *Solis Invicti,* in unexpected kinship in *Black Pearl* in handshakes in *Greetings* and in language translation in the new movie *Arrival.*

I hope you enjoy this issue of Batayan and all the unique beauties of winter in nature and in holidays with family and friends.

Jill Charles
Batayan English Editor

Essay

Solis Invicti

Souvik Dutta, Aurora, IL

A 6th grader was asked by her bus driver why she is celebrating Christmas, when she is of Indian origin. She smiled at her bus driver and said "Well, because I can." However, she herself wasn't happy about the answer she gave to the driver. She wanted to know more, she had questions that needed to be answered. She had to feel connected to the most popular festival in the country she was born in, even though she was born to immigrant parents.

The above is a true story that compelled me to write about the ancient origins of Christmas. I dedicate this article to that lovely girl and all children of different races and nationalities.

Humanity created festivals to remember certain times in the year and to celebrate time, over and over again every year. Time was recorded by a calendar. The calendar was recorded by the changing seasons and phases of the moon (lunar). Almost all ancient calendars were lunar in nature. The solar calendar we use today is most simple, but a hugely inefficient way to record time.

Four major turning points in the year are the two solstices and the two equinoxes. The Winter Solstice is very special. In the Northern Hemisphere, it is the day when the night is the longest. From that day onward, the length of day increases right up to the Vernal Equinox, when the length of day and night are the same. From the Vernal Equinox to the Summer Solstice, the length of the day continues to increase until the day of the Summer Solstice when the night is the shortest. From the Summer Solstice, the length of day gets shorter and the nights longer. On the Autumn Equinox, the night and day are of equal length, and from that day onward, the length of the night increases right up to the Winter Solstice.

Light, and hence day, was associated with divinity in ancient Greece and Rome. In *Sanatan Dharma*, light is associated with *devas* and *purusha*. Darkness was associated with demons in ancient Greece and Rome, while in Sanatan Dharma it is associated with *asuras* and *prakriti*.

The Winter Solstice and the Romans

The Ancient Romans always celebrated the rise of the Sun God over a period of three days during the Winter Solstice. They called the festival "Dies Natalis Solis Invicti," the birthday of the unconquered sun. *Sol Invictus* means the "Unconquered Sun." Unconquered is a very interesting word here. This shows the revival of light even on the darkest day of the year. It also reiterates the truth that from this day/time onward, the day, and hence the power of the sun will keep increasing in length.

The three-day celebration which begins on the day of *Uttarayan* (or Winter Solstice) is very symbolic. The number three, just like in Sanatan Dharma, represents three planes of existence among Romans too – the netherlands (*patala*), the Earth (*bhuloka)* and the heavens (*swarga*). Over three days the rise of the sun in each of the three zones was celebrated.

After the rise of Christianity in Rome, especially among the poor peasants, the nation was in a state of anarchy and dispute. At this time, the Roman emperor Constantine Icalled the First Council of Nicea in 325 CE. It was a council of Christian bishops who convened in the Bithynian city of Nicaea (currently called Iznik, Bursa province, Turkey), and it was in this council that modern day Christianity was born. Which books to be included in the Bible, which books to be left out? – these important decisions were all taken in this council after both religious and political scrutiny. Constantine had been a strong pagan and sun worshiper before converting to Christianity in 312 CE.

It was in this council that, due to the influence of Emperor Constantine I, the ancient tradition of "Dies Natalis Solis Invicti" (Birthday of the Sun God) was given the overlay of the birthday of the son of God, Jesus Christ.

Many more concepts were borrowed from the Roman God Sol and incorporated into the life of Jesus Christ. If one looks closely, one theory connects the Biblical elements of Christ's life to those of a sun god. According to the scriptures, Jesus had 12 followers or

"disciples," which is akin to the twelve zodiac constellations. When the sun was in the house of Scorpio, Judas plotted with the chief priests and elders to arrest Jesus by kissing him. As the sun exited Libra, it enters into the waiting arms of Scorpio to be kissed by Scorpio's bite.

The Winter Solstice andSanatan Dharma

From the Winter Solstice, the sun enters its northward movement and in the process, brightens up the days (as in making days longer). Beginning from the Winter Solstice to the Summer Solstice is considered a span of time which has more light, and this time period is called *Uttarayan*.

It was believed that people who leave their mortal body during Uttarayan will attain the abode of the gods (devas). This finds mention in the Mahabharata when Bhishma, with arrows pierced in his body, did not leave his mortal body until the day of Uttarayan.

Uttarayan has been always associated with the worship of Surya and Vishnu among Hindus. The Winter Solstice is considered to be the day when Vishnu wakes up from his 6 month long sleep. Vishnu is said to sleep during *Dakshinayan* (Summer Solstice to Winter Solstice) and wakes up on the first day of Uttarayan.

The celebration includesthe ringing of bells, burning of incense and loud chanting so as to wake up the gods from their 6 months sleep.

taraṇirviśvadarśatojyotiṣkṛdasisūrya |

viśvamābhāsirocanam ||

~ Rk Veda, Mandala 1, Hymn 50, Verse 4

In the above verse from *Rk Veda*, Surya is called *jyotiṣkṛdasi* or the maker of light (*jyoti*). Thus from the first day of Uttarayan, the same concept that is iterated by the Romans, is reiterated by the Hindus – the rise in the power of the unconquered Sun.

We can celebrate a festival in any way we want. We can call it by any name we want. We can belong to any race, religion or creed. However, we cannot forget that nature came first, man next, and religion was the invention of man to better understand nature. Festivals are nothing but an attempt by man to remember and admire the message of nature. We should never forget this in our arrogance.

Movie Review

Arrival: Movie Review

Jill Charles, IL, USA

Amy Adams stars in "Arrival" as Dr. Louise Banks, a linguist professor summoned by the US Army to communicate with alien visitors from outer space.

The arrival in the title is twelve enormous black egg-shaped spaceships that land simultaneously in twelve different countries on Earth including China, Kenya, Brazil, Russia, Australia and in the Montana wilderness in the United States. In each country, human experts attempt to ask the aliens "What is your purpose on Earth?"

While curious about the aliens' origins, the humans also fear their superior technology and worry about contamination with unknown diseases. The US Army mobilizes near the spaceship, to study the aliens, but also poised for a possible attack. Forest Whitaker is excellent as Colonel Weber, the Army officer who introduces Louise to the aliens. He mediates between scientists who want to understand the extraterrestrials and some political and military leaders who view them as a threat. Questions about the aliens in the twelve locales bring up mistrust and rivalries between nations on Earth, especially the US and China.

Under pressure to learn the alien language and teach them English, Louise finds an ally in another gifted scientist, Dr. Ian Donnelly, played by Jeremy Renner. Louise faces personal losses as well as the toughest linguistic challenge ever, and risks her own safety. As they begin to decode the aliens' written language, she and Ian grow closer. Translation can be dangerous, however, when the alien words for "tool" and "weapon" are almost identical.

International audiences will appreciate "Arrival" for asking the big questions about what language is and how intelligent beings from all cultures can learn from and empathize with each other. Amy Adams is brilliant in her best role since "Doubt" and the philosophical questions of how and why we communicate with each other will stay with audiences long after the film ends.

"Arrival" was directed by Denis Villeneuve, the French Canadian director of 2013's "Prisoners" and based on "Story of Your Life" is a science fiction short story by Ted Chiang. The short story was the winner of the 2000 Nebula Award for Best Novella.

Highland Park Woods

Jill Charles, IL, USA

We climbed stone steps
A century old
Up the hill where the mansion
No longer stood.

We crossed the moss green bridge
Down a path paved with acorn caps
We found the gazebo
Gray oak smooth with age.

We stood there gazing out
As the blue January lake
Churned ice floes like butter.

A metal arch marked the garden,
Asleep in a circle of stone.
The wild rose briar hid herself in thorns.

No hearth or ballroom anymore
Only squirrels danced
In ghostly white birches.
Tamaracks waved green needle fans
Where a millionaire returned his land
To these woods.

By a hollow stump,
We found acorns.
You told me you carve tables
From oak snags.
We dreamed of a house
Not yet built.

Flights of Fancy

David Nekimken, Chicago, USA

As I was sitting at my desk in school
Teacher droning on a grammar rule
I felt myself squirm and feel quite antsy
To unleash my mind in flights of fancy...

To visit all fifty states, and Puerto Rico too
Have my picture taken with the giant Sequoias
Crawl on all fours in caves small and mammoth
Climb the highest peak where the continent divides
Dive into the lowest depths of ocean Pacific...

To sail the sevens seas for places exotic
To visit the Watusi and have dinner in Zimbabwe
Stretch out in Pago Pago and watch the sunrise with Aborigines
Walk softly through tropics to see hidden people Amazon
Join the penguins on their walk in frigid Antarctica...

To be king for a day, or maybe queen of England
Live in a white house, spend time in an office oval
What would it be like to a most famous pharaoh
Or a caesar in Rome, staying home on the Ides
Or healing the sick with a papal blessing…

To finally find that cure for cancer, or the common cold
Be awarded a prize for noble peace in the world
To free the last slave, enrich the last poor in the world
To be honored for literature as enduring as Shakespeare
Live forever in the pages of history, with most friends atwitter…

Alas, the teacher called me to the front of the class
To end my daydreaming and to move my ass
I must remember to dot my tees and to cross my eyes
To be full of knowledge of trivial stuff, much less wise…

The best lesson I could learn, in and out of school
Be loving and caring to all whom I love, all whom I meet
Live each day fully, enjoy the ride to all points oneness
And above all else, to be true to myself

Mango King of Trees

Menachem Emanuel, Chicago, USA

***LUCKNOW, INDIA* – May 29, 2014, AP**, Two teenage sisters in rural India were raped and killed by attackers who hung their bodies from a mango tree, which became the scene of a silent protest by villagers angry about alleged police inaction in the case. Two of the four men arrested so far are police officers.

Mango
King of trees
Bearer of the most fragrant fruit
Evergreen leaves to grace the bridal bower
`The promise of sweet beginnings

Amika
Mother goddess
Gathers her daughters
To teach them to do no harm
To any living being
And keeps them safe in the embrace
Of the Holy Mango Tree

All this overarching majesty
Token of abundant fecundity
Is grafted on wild stock
A shrubby thing that prises
From thin poor soil
A few leathery leaves
And bitter fruit
Hinting of turpentine
Upon this unlikely root
Generations have raised
The cultivar from whose scions
Spring
The King of Trees
Fathering the sweetest fruit

At the height of day
The wanderers come to rest an hour from their path
The gatherers and gleaners of the field
Sojourn beneath the boughs
To forget the metal skies and pitiless sun
And the Sacred Mother comes to nurse her calf
All harboring in the in the shade of the Holy Mango Tree

When the sun dies in the west
The grove grows still
The golden mango birds fly home to rest
All that's heard is the thrumming
Of the cricket clan
And the faint far-away tiger cry

As it strikes its prey
Two will not return to rest
Like the golden mango birds
Hidden in the safety of the Holy Mango Tree

Strange fruit greet the rising sun
Two perfect sisters
Unripe fruit
Hung along the bough
Of the sacred Mango Tree
Mute testimonies
To something old and dark
Ancient savage ceremonies

How many millimeters how many millennia
Do you suppose
Separate
The amygdala and the pineal gland
Where dwell the reptilian remnants of our brain
From the prefrontal cortex
Where we suppose
Our sense of grace and sin begin
How far apart
Time enough later to explain
To allot the blame
To deal with guilt and recompense
Now only to stand before the holy Mango Tree
To taste the horror of it all and all
And fetch the victims down

Down from the silent Mango's limbs
These sacrificial lambs
Wash the blood away
Wind them in their final shrouds
Place them oh so gently and so tenderly
On the funerary pyre

Scream out loud
To the Master of us all
And make Him see
This is not the way
It's supposed to be
When will it be revealed
The meaning of it all

These shunned broken ones
Auctioned off
To sweat their youth away in a brickery
Or sold to slake some unholy thirst
Or made temple girls to dance and serve
All these will not come home again
Like the golden mango birds
To rest beneath the Holy Mango Tree

Sleek and sweet fleshed fruit
Within in its seed
Conceals a bitter core
Germ of a time of tooth and claw
When blood and iron made the law
When one took because they could

After the flames have done their work
All there is left are ash and dust
The rising drafts from the fire
Swirl away the garments of their here and now
To join the remnants of exploded suns
That we see tonight as stardust
Far above the Holy Mango Tree

Poem

Communication of the Self

Allen F. McNair, Chicago, IL

There is a place where I like to go
Deep within my mind and heart.
It is a place of unbounded bliss
Which I enjoy relating to others.

An unlimited reservoir of creativity.
It allows me great wisdom to express
To others about life's experiences.
I am able to tap it twice-daily.

Ideas effortless bubble up within.
My writing and illustrations grow
Inside my head, capable of fruition.
I am soon in the zone of productivity.

When I go beyond my thoughts
I experience something greater
Than the mental sum of my parts.
It is a field of all possibilities.

The deep-rooted stresses just melt away.
My mind is then freer than the wind.
Many of the poems I write provide
New insights into others' character.

The feelings and thoughts of each poem
Reach universal truths in my constant
Effortless communication of the Self.
Without poetry, I could not communicate.

Just a few words of title or theme rapidly
Expand to complete stories in poetry.
I am able to paint solid word-pictures
That have been transformed to artworks.

The energy expended in telling these stories
Is really quite minimal to my versatile mind.
Going to my place of rest and tranquility
Transforms the individual self to cosmic Self.

The Self is all there is within each person.
Anyone has access to this infinite Self.
I have had this experience for over forty years
Since instructed in Transcendental Meditation.

Poetry is the universal expression of one's thoughts.
Its great importance is very real, especially to me.
Individual pieces about homelessness and its adventures
Have progressed into an epic poem set in the future.

My mind and heart have also grown apace.
Poetry has given me a voice to be heard.
My own world is a better place originating
From thoughts and progressing into words.

My wish to be self-published has borne fruit
My epic poem, *I Dream of A'maresh*, has
Taken root in the minds of many readers
Both in the recent past and soon into the future.

I look forward to telling other stories every day.
With the constant communication of the Self
There is no end to what I can express to all.
And poetry actually makes all of this come true.

Essay

Black Pearl

Mekhala Banerjee, Des Plaines, IL

One summer afternoon the sky was clear blue with patches of white clouds here and there.

The sun was generous, which is very uncommon in Chicago. Mira loves this kind of day like everybody else, but today she is in a very bitter mood. As soon as Nicole, her babysitter, called she knew something was wrong.

"Hallo, how are they doing?" she asked.

"What? Could you please talk a little slow?"

She couldn't realize what she was saying.

Nicole replied "I got a job, so from tomorrow on, I can't come."

She hung up. Mira burst into tears with anger.

Jim, in his forties, a sincere doctor who still loves research and a compassionate guy as a boss, came out of his office to talk to her about the new project. "What happened? A babysitter problem again? You have to solve this; otherwise it is hard to finish anything on time."

She noticed a little annoyance in his tone. She couldn't defend herself because this was not the first or second time. She took couple of minutes to compose her thoughts.

"I will work evening hours after my husband comes home, just give me a week, I promise, I will find a steady babysitter."

Jim explained the work and left without much discussion. After he left, Mira started to run the sample, but her mind wasn't there at all. Her dark big eyes became full of tears with the reflection of sweet home atmosphere. Both of their parents' houses were full of people, housemaids and servants, just like a mega family. Her daughter, being the first grandchild, got enormous attention from everybody, she barely knew her mom or dad. Over there neighbors always stopped by to say "hallo".

Every day her brother-in-law Rabin after having tea and "luchi" (fried flat bread) after coming from work, used to say "Boudi (sister-in-law), feed my cute niece and dress her up. I will take her out."

Mira knew she was free for the whole evening.

They had a competition between brothers and sisters who will take the baby out to show her off to their friends.

She came to this country couple of years ago with her husband and little daughter along with a bag full of hope and joy. She didn't expect all this. It should be lot easier, rather than this. Her former babysitter finally left, it was a blessing in disguise. Every other day she had a serious reason for not showing up. Mira was desperate to find a babysitter for her six-month-old son and maybe for his seven-year-old sister, that would be optimal. Mira's boss was nice enough about it for a while, but finally he said that either Mira find a reliable babysitter or he had to find a more productive employee. This was perfectly understandable to Mira, he needed to have the results of her work by a specific deadline.

She walked home thinking about all the possible places to look for a babysitter, without enjoying the blooming bushes, or planning which flowers to plant next year. On the way she picked up several ads, and couldn't wait to call.

As soon as she entered her building, their super Mr. Richardson welcomed her, asking about the kids. He wore his usual working clothes, a plaid shirt and jeans.

She collapsed, saying, "Please rescue me from the crisis, do you know anybody? Otherwise I have to quit."

She was so tense she wasn't clear about what she said.

"Calm down, tell me what's the problem let me see whether I can solve it," he smiled. Six feet tall, a strongly built German descendant, he and his wife were very nice, always with a helping attitude.

Mira took a couple of deep breaths and told him about the nightmare situation. That day was the last

day for her old babysitter. Mira had a couple of ads in her hand, but she didn't know if any would work out.

After listening to all her worried explanations, Mr. Richardson smiled in his usual way. "Don't worry, I know one girl in our church. She seems very nice, and she was asking me about some kind of job. I will tell her to call you." He consoled Mira in a fatherly voice.

Mira desperately said "Please don't forget; thanks so much," and took the elevator to her 5th floor apartment. She opened the door, and saw Nicole, the babysitter was waiting to leave. Mira hugged the baby, said hello to her daughter, deeply immersed in TV. She had to say "Hi" to Nicole and gave her the check for her work though Mira didn't like paying her this much. She didn't even show up two days this week and left early three days last week. Well, it's over now, in a way it's a relief, Mira thought.

Nicole left. Mira sat down on the sofa by her daughter with the baby in her lap, staring at the TV screen without noticing at all. She came back to her senses by her daughter's shouting "Mom look" then burst into a laugh. Mira woke up from her worried thoughts. She wiped teardrops from her cheek. What a bad fate she had.

"No I shouldn't waste time," she thought to herself, and she put the baby down, played with her daughter's hair a bit, then went to the phone. She took the ads from her purse and sat at the dining table, on one side of her living room, so she could keep an eye on the baby.

She started: "Hello I am calling for a babysitter…No it's too far I can't drop the baby in the morning," and hung up. She called at least five or six numbers. No luck so far. She started to get annoyed. OK this is the last one, then I have to start cooking.

She murmured, "Hello I am looking..." "You talk to my daughter," the lady said in broken English with a heavy Oriental accent.

"OK, give the phone to your daughter." Mira talked to her and felt relieved, she was a Japanese lady who stays with her daughter, but the problem was she couldn't start right away.

"Well," Mira thought, "Maybe I could take days off here and there, go to work early, or work part-time, bla bla bla - at least I found somebody I want. She'll be available in only two weeks, I can manage somehow."

"Oh no," she jumped when she heard the time on TV. She had to start cooking, her husband would be home in a couple of hours. "Thank God he comes late" she thought.

She heard knocking at the door, and said "Who is it?"

Then they heard the familiar voice of Mr. Richardson. Mira greeted him with "Come in."

He replied "No, I was about to sit down to dinner, and all of a sudden I remembered my promise to you. Here is the girl's phone number."

Then he left, and didn't wait for Mira's sincere thank you. But he heard it through the elevator doors. Mira didn't wait to call the number. But no one was there.

"Well tomorrow is Saturday, I can call then. Friday night, no one stays home, especially the young people," her husband always says.

She went back to her kitchen, keeping an eye on her kids. Her daughter was playing with her brother. Mira finished her rice, chicken curry, lentil and spinach dishes. Then they heard the door. Her husband came in. Pretty soon they started dinner, with the baby in the high chair. Mira told the whole babysitter story to Dilip, her husband. She couldn't wait. After all the cleaning was finished they went to bed. Mira couldn't sleep at first, then she dreamt the babysitter turned her down.

She woke up in a cranky mood. Even before having breakfast, she called the number Mr. Richardson gave her. After a couple of rings, she got worried.

"Hello" said a woman's voice.

Mira said "Hello. I am Mira. Mr. Richardson gave me your phone number. Would you like to babysit?"

"Sure," replied the voice, "When do you want me to start? I can come today to meet you."

"Wonderful!" Mira wanted to dance. She didn't expect this quick and easy solution. She couldn't wait to see her new sitter. Mira woke everybody up, and finished breakfast. She wanted to get busy so time would pass faster. Finally she heard the door buzzer.

"Who is it?" called Mira.

"It's Doris, I'm supposed to come to meet you."

Mira pushed the buzzer, then opened the door, waiting for Doris. Those couple of minutes seemed like an hour.

"Oh no!" Mira couldn't figure out from the accent

on the phone if the person is black or white. She was disappointed looking at her, a tall, slim, African American girl neatly dressed in a skirt and sweater. She was a young girl in her twenties.

"Come in, have a seat." She welcomed Doris anyway. They both sat down, so Mira could find out about her. Mira was even more upset, when she learned Doris worked in a hotel at night.

Mira looked pale, talking casually. "Where do you live?" she asked. "I need somebody at home at least by eight."

"No problem, I get off from work at 7:00, so I will be here by eight. I won't go home from work."

About an hour later Doris left. Mira told her husband, "I didn't like her, the place she lives sounds like a real slum. Not only that, she works at the hotel at night."

Dilip replied. "But she sounds ok to me, she is a telephone operator."

"That's what she said," Mira replied with a caustic tone. "She wouldn't say what she actually does."

"But," Dilip said calmly. "Why would a person lie, first of all, and secondly, if she is a bad person, she wouldn't look for a babysitting job."

"Well," Mira sighed, relieving a deep breath. "I don't have a choice right now, but after two weeks, that Japanese lady will start."

Mira went to take care of her son. Dilip had to take her daughter to swimming. Saturday and Sunday passed the usual way. Monday morning came, and before Mira had a chance to worry, the door bell rang.

"Who is it?" Mira even forgot that the babysitter could come on time.

Doris entered with a big smile on her face. Mira kept talking and showing Doris what to do. Finally she left full of worry that Doris would sleep all day long, and she was sure something bad would happen to her son. She called home almost every half hour.

Nothing happened the first day. Every day afterward she came home thinking that she could find something wrong so she could fire Doris. No, not today. Eventually two weeks passed without any incident. The last day Mira paid Doris the same amount she was paying to her former babysitter. Doris didn't complain. Mira was happy to tell Doris that she found another person who will charge a lot less, and that money was a big matter to them at that time.

"Oh my God," thought Mira, she didn't expect this at all. Doris said she wouldn't mind getting less pay, but she absolutely needed the job. Mira was confused, she didn't know what to do now. She couldn't come up with another excuse. Doris kept saying she had lots of loans she had to pay back.

"OK I will call you on Sunday. I have to talk to my husband," said Mira.

She was trying hard to let Doris go. Mira closed the door, sat down and called the Japanese lady. She said she'd start on Monday. Oh, that made Mira is extremely happy. Finally she told her husband the whole exciting story, how she finally got rid of Doris.

"Oh, not again," Mira thought, when Dilip told her to keep Doris.

"Why? I don't know what she does at the hotel. On the other hand, this old lady is very nice could be just like our mother." Mira was persistent.

Dilip nodded his head. "If you want, you can take the Japanese lady, but you are not doing the right thing. You are assuming everything you think about Doris, and that is not right."

So it went on and on, the young couple's argument over their babysitter.

Dilip's view was rational. "Doris needs money, and the elderly woman lives with her daughter. She doesn't need money that badly. You should not do any injustice. The poor girl trying hard to be honest, you should give her the job."

Finally Dilip won. Mira said "OK, I will try two more weeks and if I see anything wrong, that's it."

And believe it or not, that two weeks never ended. Mira loved Doris so much she wouldn't let her go for four years. Finally her son needed to play with other kids at some preschool. Doris taught Mira's daughter good behavior, and read them good books all the time. Finally Mira had to move, she and her children couldn't hold back their tears.

Every year for the next several years Doris sent a birthday card for the kids with some gifts. She was a poor girl trying to make ends meet, but had a very rich soul. Mira thinks about Doris sitting in the porch of her new house. Once Mira bought a very pretty white dress for Doris.

She was very happy but said, “I won't wear the pretty white dress, because I'll save it for my wedding.” She was a pure girl, in her mind, in her character.

Mira heard all her stories, of growing up, it was a typical poor neighborhood. All kinds of problems were around, everything we see on the news. Mira thinks that proverb is so true, “Don't judge a book by its cover.” She is a genuine pearl and needs no description.

It is almost three decades later. Still Mira and her two kids, now adults, sing the Christmas song taught by Doris. “On the first day of Christmas my true love gave to me----”

It was so beautiful then, now it brings a joyous resonance in their heart where still hangs a portrait of a big-eyed girl with a sweet smile. She herself is a woman over 50 now. Someday maybe their hope will come true.

Essay

Greetings

Bani Bhattacharyya, Chicago, USA

Hello, *hi* and *hey* are common greetings, but do we ever think about the deeper meaning behind all these exchange?

People of different countries use different body language, expressions, and gestures when they greet each other. Many of us follow his or her custom without much knowledge of what it represents.

An age-old handshake is a technique of communication to show peace when the right hands of two individuals are held tightly with thumbs spreading out, demonstrating that hands hold no weapon. Over the years, it has evolved into a customary sign of friendly greeting, commonly practiced, mostly in the Western world where the vertical posture of two people facing each other holding right hands is also means equality and trust. It's a universally accepted business gesture now.

A salute is specially done by armed forces in a military atmosphere.

It's a sign of respect when one person stands erect in front of another and touches his or her right index finger on their forehead to praise the other. Saluting originated when knights greeted each other by raising the visors to show their faces. Over the years a simpler gesture of grasping the visor became common.

The Islamic way of greeting is *Salem*. People bend down halfway to bow and put their right hand on their forehead repeatedly as they say *Asalamalakum,* to express "*Peace be unto you."*

In Australia and New Zealand, the Aboriginal natives greet people by touching the nose to nose. They explained to me when I was there, "This way a breath of air from each touches the other and they come to feel for each other. They do this to each person anywhere they meet and want to be acquainted even if they are not related."

I had to follow their customs when I was invited to some Aboriginal people's home in New Zealand with our tour guide. I had to touch our guide's nose with mine and also to each person of the house where I was invited to eat. I felt uncomfortable at first, but then I said to myself: *It's fun.*

In Hawaii, *Aloha* and Ma*halo* are common words used to greet others accompanied by a garland made of fresh flowers. Aloha means "the presence of Divine breath" and *Mahalo* means "May you be in the Divine breath." *Aloha* also means "hello" and *Mahalo* also means "thank you." The *Shaka* sign consists of extending the thumb and smallest finger while holding the three middle fingers curled. It means "hang loose" which is a friendly gesture. It means friendship, compassion and solidarity among various ethnic groups.

Namesthe, is the Indian way to greet and pray. The word comes from Sanskrit. It is a gesture in Indian custom to greet all people or pray to Indian lords, gods and goddesses. It is a gesture whereby a person joins both hands near the middle of his or her body and bows down at the same time. This is the symbol of respect for all human beings and to our Lord. When an Indian person salutes by bending down or touching an elder's feet with his or her right hand, it signifies that he or she reduces his or her ego and shows respect to the other. Joining hands together in front of his or her body represents togetherness and unity. It signifies oneness. The same respect is shown to all human beings as to their Indian deities.

In Tibet, it is conventional upon greeting someone to stick out the tongue just a bit. This practice comes from the belief in reincarnation; a cruel 9th century Tibetan king had a trademark of *black tongue.* When the person sticks out the tongue which is not black, it signals to another that he or she is not a reincarnation of that bad king.

Cheek kissing is a gesture used in many parts of Europe, the Mediterranean, and the Middle East and in the horn of Africa, where two people greet by slightly bending down and lightly touching their lips on each cheek. They call it *faire la bise.* This ritual indicates friendship, a greeting to confer congratulations, to comfort someone, to show respect.

Over all, traditional greetings ranging from region to region have developed into cultural forms to recognize and show respect to each other in every part of the world.

In the field

Viola Lee, Chicago, IL

I keep seeing it.
The forest green door in the corner
columns made of marble,
thick, huge, nothing to penetrate through.
The dark tunnel
where we descend
our quiet anxiety sets in
you get it from me
or is it the other way around?
We continue
go on and beyond and further.
The dark tunnel carries us
passed white walls
what shall we look for?
what shall we fall back upon?
I hear the sounds of people behind and beyond
a man and a woman are arguing
and their daughter somewhere in the middle
seems like this may happen often.
But we descend further and further.
I am carrying your sister
and suddenly what feels like a cloud is not a cloud.
We continue to walk down descending down
an echo, an eon, an earful.
As we come closer
we see this
the presence of it, aches,
a body wrapped
the tattered cotton becomes
a part of the marble
swaddled in dark black
burnt cotton.
I keep seeing it. This
Mystery. Let it be.
I have brought you down to this.
Let us go then and share this with our neighbors.

Poem

IRIS

Tinamaria Penn, Chicago, USA

first look
into his two windows
reflecting glint illuminates his colorful soul
appetite for living this thing called life
calls me to his center
let me peek before I engage

second look
draws me out of my own energy
by his transparent lens I am captured
mesmerized by his teacher quality rays
volumes I am taught through clear crystals
meaning of love is embodied in his look at me
through his lenses I found the missed love
skeptically I turn away from the light
afraid of its essence

I never knew true love existed
active pursuit tells me not to be troubled
keep looking into his eyes for more education
I sit still for more moments to listen
his eyes speak volumes
love peers deep into my iris
invites me to move into our first kiss

Poem

The Green Fire

Jill Charles, IL, USA

Her love is a helium balloon

That longs to lift you.

Her love is the antidote

You will not drink.

Her love is the sweet green clover

Where you won't sink your toes

For fear of bees.

Her love is a joke in Japanese

You could not translate.

Her love is a panang curry

And you fear the green fire.

Her love for you is bold and honest

And your love is a thin white potato sprout

Crying for the sunshine you deny.

Liam, 18 Months Old

Bakul Banerjee, Chicago, IL

Your gentle, wordless greetings across
the baby gate spreads like the persistent joy
presented by this sunny summer day.

I pause in your domain with toys
of rainbow colors. Alligators and airplanes
materialize from your picture books

bringing back memories of journeys to
Everglades and my hometown Kolkata - the violin
plays by itself reminding me of my adult girls

In the park the wind blows chalk off the baseball
diamond - you laugh, showing off your tiny teeth
I mimic as best as I can - same pitch and frequency

Soon, your mama and I munch on our lunch together
Paninis and salads, with fizzy lemonade - you insist
on joining the conversation by rattling the high-chair

We, the threesome, continue the laughing exchange,
punctuating with occasional peek-a-boo games
I worry about *do 'gains* but that does not happen

It is time to say goodbye to your mama and you.
You stand steadfast framed by the storm door
in our brains, we store pictures of each other.

Poem

Regarding Utopia

M. C. Rydel, Chicago, IL

They think they can build something perfect,
A castle on the tip of a peninsula
Separated from the mainland by a moat,
Where you leave all the doors unlocked,
Feed the neighbors, pray however you want,
And tolerate graffiti and revolution.

I spray paint footprints on the mailboxes
And stone walls, fight off their trances
And enchantment the way the west wind
Might breathe autumn into an August day
Scattering leaves on cobblestones,
Months before it's supposed to happen.

I love life in something, almost perfect,
Embrace quintessential sorrow
Savor lost loves and squandered fortunes,
Sunbathe half naked next to the misty sea,
And protest perfection for the sake of stains,
Litter, diapers, stuttering, and white lies.

They have, in fact, created something perfect,
Perfect theatre, fiction, science, and art,
Reality projected on a movie screen,
A synthetic pearl, a silk rose,
A morning fog like an angel, a bodiless body
Who makes us forget everything one life to the next.

I am just trying to remember last night,
The utopian coffeehouses and pubs,
The latte, beer, vodka, and rum,
Taking a boat out into the bay
The illuminated castle like a chocolate candy
Ready for the continent to consume.

Crossroads

Sujay Datta, Ohio, USA

The world is at a crossroads today
We, its stewards, have choices to make
It's time to answer the hard questions
As they'll determine the course we take

The choice is between “I” and “We”
Have we the courage for sacrifice?
To forget our myopic visions of life
And proclaim that restraint is not a vice?

Must we squander all blessings inherited?
Must we seek timber from every tree?
Must we destroy our shared abode?
By letting our greed run wild and free?

Must we exploit our mother nature
For short-term profit, instant gain?
Must we poison the air we breathe?
Use every stream as a sewage drain?

Must we burn more fossil fuel
Until the sky turns dirty brown?
Must we ignore the warming earth
Until she loses her polar crown?

We grow up learning “More is better”
“Prosperity should know no bounds”.
But when we compete and compare,
The more we prosper, the less it sounds.

This mad rush for wealth will bring
A day when no bird's left to sing,
No bounty to sustain us, no beauty to cherish;
Only we, foolish humans, doomed to perish.

That fateful day is quite near.
The clock is ticking can't you hear?
Let's heed the warning; the message is clear:
Change for the better, and there's nothing to fear.

Short Story

Twas the Night Before Christmas 1956

Maureen Peifer, Chicago, IL

It's really dark out and freezing cold. Dad's just come home from a double shift at the printing press where he works with his freshly cashed paycheck.

Mom's helping us bundle up so we can walk over to the Christmas tree lot west of Clark Street on Devon. We're all really excited, tumbling down the three flights of stairs and hit the lobby running. Dad has his dark green stocking cap pulled down over his ears and a light jacket over his sweatshirt. We're in snowsuits Marty's brown, mine blue, Ginny's green (it's my old one). Mom's tied scarves around our faces, our boots are all buckled and zipped.

It's finally Christmas Eve and we're gonna get our tree! Just like always, we walk with dad, clouds of breath pluming from our mouths, singing "God Rest Ye", "We Three KIngs", and "Deck the Halls". It usually takes about four songs to get to the lot.

The bare white bulbs are strung around the edges of the lot so we can get a good look at the trees.

"Whaddaya think," says Dad, holding one up.

"Nah," says six year old Marty authoritatively, "too short!"

" And it's got empty spots," I add. "Nope!"

"This one ?"

"Nope, don't like those skinny needles."

"Scotch pine, says Dad." don't hold ornaments well either. We look and look freezing but so excited.

"Wait, how 'bout this one? " Dad says, grabbing a tall beauty from a back corner.

"OOOH YEAH !" we all croon, "that's it Dad !"

"That's a $10 tree, sir," says the little Armenian man, chewing on his cigar. (the lot's run by the Armenian Cultural Center across the street)

"C'mon," Dad asserts, "it's Christmas Eve, you're not gonna sell that tree to anyone now. I'll give ya $5."

"How bout $6 ?"

"Done!"

The man wraps it round with twine and hands us each a candy cane. Dad picks up the trunk, we position ourselves along the tree me at the back, 'cause I'm the oldest and strongest, Ginny up front by Dad, 'cause she's only 4 and doesn't really carry anything, just holds the rope. Marty manfully grabs the midtrunk in his 6 year old mitts.

The way home is "Jingle Bells", "Away in a Manger, Jolly Old St. Nicholas", and, right as we turn onto Greenview, "Rudolph."

We stand it upright and Dad goes up the back stairs so the janitor won't get mad at us for leaving a needle trail in the hall.

Mom rings us in, makes us leave our boots in the hall on newspapers, and helps us hang our snowsuits in the closet. A plateful of Pillsbury roll sugar cookies we had sliced, baked, and decorated with green and red sugar are waiting on the table and the Hershey's cocoa is just warming on the stove. She ladles out mugfuls, plopping three Campfire marshmallows in each mug. Dad has set the tree on the back porch and is chopping away at the trunk so it will fit in the green cast iron stand Mom has set up in the corner of the front room near the eight paned door leading out to our little third floor outside porch (only used in summer screens, but no storms). We had decorated each pane with pink Glass Wax stencils of Christmas trees and wreaths that afternoon to provide a fitting backdrop to the tree.

Small electric candles stand in each of the three front windows to light the way for the Three Kings. Gold tinsel wreaths hang from the window locks above, each bearing a small round gold braid trimmed photo of one of us kidsme on the left, Marty center, and Ginny on the right. Mom had just gotten them on special at the Rexall Pharmacy on the corner and was quite pleased.

Boxes of ornaments from Woolworth's full of shiny colorful globes lay on the glass coffee table, boxes of lights on the couch, candy canes and tinsel on Dad's chair. Three nails equally spaced across the edge of the mantle would hold the white felt stockings Mom

had stitched from a kit last year, each carefully assembled with our names in alternating red and green Italic letters on the cuff, a red ribbon hanger and a jingle bell on the toe (Santa would have to be really careful filling those!)

Dad brought in the tree and Mom turned up our little grey plastic Motorola radio so the Christmas carols playing filled the room. He and Mom eased the tree into the stand, turning and shoving as she lay on the floor tightening the bolts that held it in place.

"OK guys, what's first now?"

"Lights!!!" we all squealed.

"Maureen, hand me that string."

I carefully picked up the lovely large multicolored bulbs checking to be sure they were tightened in their brass sockets and strung them over to Dad as Mom connected the next set and the next until all six sets were on the tree.

"Ready, Marty" smiled Mom, "OK, plug 'em in!'

"Wow," we all gasped, as excited as if we were at Rockefeller Center.

Ginny was fading fast, clutching her cocoa in her tiny fingers. "Come on little girl, bring over that box of ornaments," Dad said hoisting her on his shoulders so she could do the high up ones. "That's itoopsneed one over there!" He set her down gently after 2 boxes and she wandered off to get another cookie, laying her head on Uncle Connie's foldout bed in the dining room and drifting away.

Meanwhile, Marty and I had at it, filling in ornaments, candy canes, and finally, the tinsel. Mom had separated each strand handing them to us one by one. She could make 2 boxes of tinsel work for the whole tree!

"Whose turn for the star this year," said Dad, "didn't you do it last year, Mo?"

"Yeah, it's Marty's turn." Dad hoisted Marty up to put the shiny silver star atop our tree and we all stood back to admire our handiwork, hug, and kiss.

"Now, off to bed," Mom said sweetly, "or Santa won't come."

"Wait, we have to get the cookies and cocoa!" Marty and I announced in unison.

"Right," dad winked at us. "Mo, you and Mom get the cocoa and while Marty and I refill the cookie plate."

Mom and I fill Santa's special red mug while Marty and Dad arrange nine cookies on the matching plate, one for each of the reindeer, one for the Big Guy.

"There you go," Dad whispers as we set them on my doll table under the tree. "Now off you go. Merry Christmas to all and you all a good night!"

Travelogue

Hiking the Whites in Appalachian Trail

Saumen Chattopadhyay, Aurora, IL

At dawn on Saturday, October 1st, 2016, I headed to Chicago Midway Airport. My wife whispered, "Be careful" in her dozy voice. I put on my new hiking shoes and the jacket I gathered for my week-long hiking adventure in Appalachian Trail (AT) in White Mountains, New Hampshire. The AT is the longest hiking trail in the world, it runs 2190 miles (5 million steps which traverse through 14 states) ranging from Springer Mountain in Georgia to Katahdin in Maine. Most thru-hikers take between five and seven months to hike the AT. The number of thru-hikers has increased over the years, a total of 3064 registered in 2016 compared to 1927 in 2015, recorded by Appalachian Trail Conservancy. The Appalachian Mountain Club (AMC) maintains more than 300 miles in AT, including over 100 miles in the Whites. The stretch of the Appalachian Trail in New Hampshire is widely seen as some of the hike's most challenging and rewarding terrain: the pathways ascend and descend through large rocks and huge boulders, slippery when wet but offer gorgeous views of Presidential Range, Franconia – Pemige was set Wilderness, Crawford Notch- Sandwich Range, Moosilaukee-Kinsman, Carter Range-Evans Notch and North Country-Mahoosuc Range. AMC offers 8 unique huts ("High Huts of the White Mountains") located within the spectacular locations of White Mountains. The huts provide cooked dinner and breakfast to hikers along with co-ed bunk beds. The huts located above the tree line (Lakes of the Clouds Notch and Madison Spring) are open with full service from June 1 through mid-September while the others (except Carter Notch, its full service session is open through September 16) stretch through October 21st. The AMC huts are very popular, and have provided facilities to hikers in back country for over 125 years.

"Your Osprey backpack looked professional" my daughter texted me last night but I was still worried about the hiking poles sticking out of my pack. "Will Southwest Airlines accept my pack in check-in baggage? Why wouldn't they just allow it as a carry on? Why would someone want to threaten security with hiking poles?", I murmured. Well, it is what it is – hiking poles are prohibited in the cabin; one can fly in the air only with plane wings, but not hike I guess. At the airport, the Airlines' staff grudgingly accepted my pack and reminded me that there was no compensation for any damage. I also had to carry the sleeping pad, originally acquired for my daughter's school's camping trip, with me. Before landing in Boston an Airlines' crew announced it's raining. I remembered reading the weather in the Whites is always erratic, I was glad I changed my plan at the eleventh hour to avoid hiking Mt. Washington (6288'), one of the 10 deadliest mountains in the world in treacherous weather (since 1849, nearly 150 people have died on Mt. Washington where wind velocity could reach highest in the world - a maximum wind speed of 231 miles per hour was recorded on April 12, 1934).

At the baggage carousel of Boston Logan Airport, there was an announcement that a bag got stuck in the conveyor belt causing delay. I was counting minutes before other fellow passengers would stare at me! What if it turned out to be my hiking poles poking out of my backpack. What if they arrive crooked? Trekking the Whites in the Fall (slippery rocks) without the poles; that seemed a nightmare! My pack finally arrived without any damage (thank God!) and I embarked on my journey to Mt. Lafayette parking Lot in Franconia Notch. I wanted to pick up some candy as I recalled a sister urged to tote – "they are great thrust quencher on the trails", she said. After a quick lunch at Wendy's and grabbing a few packs of colorful candies that were on sale at Candia Road Convenience Store in Manchester, I hurried to my destination. It was getting late and I had to climb 4200 ft. to AMC's Greenleaf Hut from Mt. Lafayette parking lot on Old Bridle Path (2.9 miles to the hut). The trail mileage in the mountains is puzzling and almost every hiker blames the milepost counting because it takes way long to hike the strenuous AT in the Whites than a stroll at the neighborhood forest preserve.

Hiking the Old Bridle Path was my first experience of the Whites. As I got off my car at the trailhead parking lot, the thin mountain air stroked me. The Franconia Notch looked like a dreamland; I was surrounded by

mountains sloping into mist covered lush valley decorated in fall leaves that were transforming from bright yellows to vibrant reds. I started the ascend to Greenleaf Hut through the Old Bridle Path as it entered the forest. I was a bit unprepared on my first hike with my shoe laces not properly tied, hydration bladder not filled with water, and I was reaching out for snacks too frequently. My reality check was to ask the descenders how long before I reach the hut. I realized I would miss the dinner served at the hut at 6 p.m. sharp unless I speed up. I reached a ledge, about half way to Greenleaf Hut. It was the first worthy reward with magnificent views of Franconia ridge partially covered with mist. It's hard to pass by the view. The veils of mist covered the crowns of surrounded peaks and the quaint valleys sparkled with flashes of fall colors. Well, the level of difficulty dramatically changed after the ledge. From here, the trail climbs the three miseries and comes out to the hut at tree line. The first trail misery was to ascend through large boulders while the second was climbing granite like rocks with slippery slopes and sharp edges. I saw a duo sliding down the rocks who told me to put away my poles and climb like an animal using both hands and legs. Ah, I then understood the natural survival reasons behind biological structure of animals.

Before the daylight completely faded I reached the fork where a board showed the arrow toward Greenleaf Hut that was 1/2 miles away. It was 5 pm. I cheered with the joy of having a hot beverage after a long day and the last ½ mile seemed especially dreadful. Perched at tree line, the Greenleaf Hut offered a panoramic view of Mt. Lafayette (5249') and Pemige was set Wilderness.

I could hear the whistle of cold wind making ripples over the calm waters of Lake Eagle that the hut overlooked. Tired and cold, I wanted to go inside for a cup of tea but the enigmatic charm of the Whites bewildered my senses as I stood at the deck looking at the valley that was slowly disappearing in mist. "Come in, are you staying here tonight?" an AMC staff (AMC call them 'hutcroos') extended a warm greeting. Inside there was an interesting set-up with 2 co-ed bunk rooms with 48 bunks. Bunkhouses were not heated and had no lighting. The solar light in the dining area would go off soon after dinner when it was time to rest. The Greenleaf Hut was completely full with adults and kids with a large group coming on board. I enjoyed the family style dinner where hikers shared their stories while savoring the hearty meal starting with a delicious lentil soup! In the midst of back country wilderness, the commotion inside Greenleaf Hut sounded unreal to me. The croos were young and lively. They served and entertained the hikers with information, nature talk and their impromptu acting. I met with Tom, a hut volunteer who suggested me an alternate route to my next stop, Galehead Hut. The night was eventful. The parents were trying to discipline the kids who had more fun playing hide and seek in the dark and escaping outside through the back door. The wilderness of the Whites kindred the inherent spirit in young hearts away from electronic gadgets and complexities of growing up in civilization. With the wind hissing through the peaks of Mt. Lafayette trampling into Pemige was set Wilderness I dozed in hearing the whisper of the Whites, "I am free and wild is my nature."

On Sunday morning, the croos woke us up with violin and the breakfast was served at 7 am sharp. I got a special vegetarian meal. A good breakfast is the only fuel that runs hikers during the day lest frequent snack breaks slow 'em down. A nine to ten hour day is normal for a 'hut-to-hut' hike and the hikers look forward to the dinner served at 6 pm. It was drizzling and everyone was prepared for a challenging day. The trails in White mountains are rugged with huge boulders and it's dangerous in wet conditions. In fact, Donna and Rob who were on my dinner table suggested I wear micro spike underneath my shoes to grip over snow/ice because freezing is common condition in the Fall. Donna was very nice to gift her extra pair of hat neck warmer given my week-long adventure in the Whites. Instead of trekking the Garfield Ridge trail to Galehead Hut I planned to descend the same Old Bridle Path to Lafayette parking lot, drive my car to AMC Highland Center (my destination in Crawford Notch after 'hut-to-hut' hike),

and take a shuttle to Gale River trail and hike up to Galehead Hut. This'd save me from hiring a cab service to get to my car, which is uneconomical in the Whites (no Uber available there yet). Going downhill on Old Bridle Path was more demanding than ascending. Wet and slippery, the rocks were almost impassable, especially the granite rock misery. In the wilderness of White Mountains, I was alone in inclement weather with my 30 lbs. pack trying to keep my balance on steep slide of rocks. It was quite chilling! Last night I heard the croos saying the rescue operation is very difficult in the Whites. "If I fall, my adventure in the Whites would end up in a hospital or a crematory", I thought. Then the image of the Himalayas appeared in my mind and how ascetics survive the hard-bitten conditions without any gear. All they carry with them is 'faith'. I collected all my strengths and plunged into the slippery rocks while chanting "Om Namah Shivaya." Well, that did the magic! I came down to the ledge safely and the weather seemed to turn better. As I was coming down to the valley, the forest boasted vivid hues of transforming leaves, it was peak foliage season in New England. From Lafayette parking lot I hurried to Highland center.

The scenic drive from Franconia Notch to Crawford Notch was gorgeous with towering mountains and opulent valleys. There was no time to stop and snap as I had to catch the shuttle to Gale River trailhead. After a quick lunch at Highland Center I boarded the shuttle. I was the only passenger and the chatty driver promised to halt anyplace on the way so that I could take pictures. Thanking him at the trailhead I started my 5-mile hike to Galehead Hut around 2 pm. The Gale River trail was peaceful and deserted. I hiked alone for 4 hours and didn't meet anyone on the way. In the last 1 ½ mile, the endless staircase of rocks was quite arduous especially after a nerve-racking downhill from Greenleaf Hut that morning. By then I was on the roll by developing a bonding with the Whites, the strain and exertion felt part of being there in the nature. Sometimes I chanted in loud voice and sometimes quietly, hearing the bear bell in my pack constantly ringing in a rhythm. There in the back country of Appalachians I marched along to Galehead Hut. Galehead Hut (3800 ft.) sits just below Mt. Galehead (4026') and South Twin (4902'). Before the hut there was a vista which was partly covered with mist when I reached. Hikers present there applauded "you made it!" Galehead hut was my most favorite destination in this trip. It was open, quiet with a few hikers. The croos were more personable yet nimble. Soon after I reached I noticed another hiker arriving completely drained and that was Moses hiking from Zeeland Falls Hut, my next destination. We became friends and shared our stories and the same bunkroom. The dinner was again great with hearty meal, mostly vegetarian that night. Paula, the hut volunteer in her 60's, was in our table. She shared her stories, including the heartbroken death of 66-year old Ms. Largay in Appalachian Trails in 2013 who took a wrong turn and went toward Maine. Ms. Largay had put up her tent in the Maine woods and waited nearly a month for help that never came. She chronicled her journey in a notebook and her last entry reflected a strikingly graceful acceptance of her destiny. "When you find my body, please call my husband George and my daughter Kerry," she wrote. "It will be the greatest kindness for them to know that I am dead and where you found me — no matter how many years from now."

Unlike Greenfield Galehead Hut had 4 spaced out co-ed bunkrooms that sleeps 38 people, allowing a little more room for everyone. Although I learned by then how to cope up with the noise of snoring in a shared bunkroom, it was overly loud that night! Both Moses and I huddled up to get the ear plugs from the front desk (there was a reason for them to be there!). Getting up Monday morning followed the usual AMC hut schedule, but instead of violin it was a wakeup call with the poetry read by JP, one of hut croos. My plan was to stay back at Galehead Hut and enjoy the serenity of Galehead mountains. Rather than taking another long hike I wanted to give some rest to my fatigued body and set out a journey to my inner world that day. My beloved spot was the opening before the hut overlooking the valley. After a great breakfast the hikers headed off to their trails one by one. Moses was still tired and dawdling a bit before his next tough hike to Greenfield Hut through Garfield Ridge trail. He was rather envious to my plan, "so are you going to enjoy here, right?", he asked. I waited until all hikers left and then took a seat over the rock in front of the valley. Morning mist covered up the valley encased with the summits of South Twin and the Galehead mountains. It was a bit chilly but the caressing of brisk air, dewdrops and the melody of bird chirping slowly drew my mind in. I remained seated still for 1 ½ hours. During my journey this was the greatest gift I received from the Whites in the morning of Monday, October, the 3rd.

After getting back to my senses I noticed a few hikers arrived at the hut, including a group of girls who work at the Highland center. AMC staff get free room and board in their huts, a nice perk for the outdoor lovers. In search of silence I hiked up to nearby Galehead mountains. The short mossy trail went straight up covering a beautiful pine forest. Before reaching to the summit there was an overlook on the edge of the crag. An ineffable tranquility captivated me at the peak. Suddenly the mist started to disappear. The sparking valley emerged before my eyes almost magically. Glorious, heavenly light shone through the blue sky with wispy clouds and the dazzling peaks of White Mountains met the lushvalleys. From atop I could see the Galehead Hut tucked inside the ledge.

That moment at Galehead mountain painted a breathtaking picture in my mind and I remembered, "The world is your canvas – leave the painting to your eyes." Back in the hut I was surprised to see Moses – he felt completely drained on the way and chose to return to Galehead Hut. Moses supposedly read a book at the hut that described the main reason behind most mishaps in the Whites – the hikers didn't go back! The afternoon weather was mellow and Moses and I climbed up to Mt. Galehead again. This was the only time I hiked with someone in the Whites besides my party of three, I, me and myself. I indeed enjoyed the company of Moses and our sundry chat. I met new hikers in the dinner table, listened in to their hiking accounts and retired early to rest for my next day's 9-mile hike to Zeeland Falls Hut. I had a chance to choose the best bunk in a quiet location, so there was no more snoring episode that night.

After a good breakfast I got an early start since this would be a long day with lots of gaining and losing elevation. There were a few groups going on the same route to Zeeland Falls Hut. I was the first to embark on and It took me about an hour to get to the top of South Twin. Pretty steep climb at 1100' in 0.8 miles. After the real misery of vertical rock climb, I was enthralled entering the magnificent pine forest.

While white clouds swinging on the forest top, the roots of tall evergreen trees remained interlocked inside the carpet of moss-grown forest floor. Immersed in the scenery of South Twin's showcase a crisp woody smell slowly engulfed me. Inside me then played a tune of harmony and I felt the kiss of mother nature on my forehead. "Miles to go before I sleep, mother!" I said, "save me from dangers and fill my heart with your grandeur!" At South Twin I got a 360 degree views of the Twin Mountains. At the summit above the tree line, it felt nearer to sky where I could almost dive into the clouds. Pushed on for another 2 hours or so before I got to the summit of Mt. Guyot (4580'). In between I went through some interesting fir waves - first time I'd actually been in one looking out. By this time the fog was settling in and I almost missed the views into the Pemige was set Wilderness. I peeked underneath the cloud covering the gorgeous view at the peak of Mt. Guyot. About another hour and half brought me to the summit of Zealand Mountain (4265'). The sign for the summit spur said just 0.1 miles so the urge to bag another 4k here was irresistible. Given the poor visibility with fogs I continued on. After another hour of hiking through beautiful woods and bogs I saw a small sign pointing to the right that simply said "View." I heard the panoramic views of Mt. Zealand is indescribable. the view begins to open through the trees walking onto the ledge it looks like Whitewall Mountain coming across the valley and standing in front of the viewer. Across Zealand Notch there are layer after layers of peaks jumbled together to create an incredible vista. No matter how joyous the journey is there would be some

melancholy that drives us toward fulfilment. In my expedition I missed the two best views of the Whites (Mt. Guyot and Zealand) and vowed I'd revisit soon for these two amazing scenes! From here it's rocky downhill that did not seem to end. Tired and exhausted my knees were demanding a break after 6 hours but I wanted to reach Zealand Falls Hut promptly. Later, I wondered about my worry and desperation of reaching the hut when I got closer. Something I have to work on to enjoy the journey all the way than reaching the destination.

As I was descending to Zealand Falls Hut, the vista of Zealand Notch and eastern Pemige was set Wilderness opened with blazing fall colors. Zealand Falls Hut was very different from the other two huts. The sight and melody of Zealand falls - the white water cascading down a series of rocky outcrops, gave the effect of many waterfalls rather than just one. The water flowed on its way, swirling, plunging in Zealand pond. Zealand Falls Hut was an older hut with a smaller dining area and two bunk rooms that sleep 36. The hut was fully packed and I had to tuck myself in the upper-most bunk. Well, another climb with my backpack after 8 hours of arduous hut-to-hut trekking. The meal was good that night but I missed the inviting ambiance of Galehead Hut. Still, a reward was pending. At twilight, on my way to the washroom which was outside the main bunk rooms I gazed at the sky, and it was stunning! A canopy of shimmering stars illuminated amongst the ocean of blackness. I could see the shadow of cliffs on Zealand Pond, the water glistened, mirroring the dazzling assemblage of glittering stars.

The next day, golden sunlight kissed the summit of Zealand Mountain and the sky was brilliant blue. I set off a 5-mile hike to AMC Highland Center through A-Z trail. The forest path raged and the trees were on fire.

I was mesmerized with the view of Zealand pond as I turned the corner. The still water resembled a mirror creating a perfect reflection of the surrounding mountains covered with dazzling trees with fall hues. A few boulders in the water made picture perfect panorama.

I remained unfulfilled with the photo shoot session; no matter how hard I tried I couldn't capture that ineffable beauty with my camera. The A-Z trail was relatively easy yet my fatigued legs kept whining. The trail leading to Mt. Tom (4052') passed through a fine forest with rich flora, fern, white spruce, pine, aspen and maple blending the pastel of different shades. The summit of Mt. Tom did not offer any views except the spectacular forest floor enwrapped with vivid fallen leaves. As I started the descend my strained knees started protesting vehemently. After two long 'hut-to-hut' hikes most hikers feel stiff thighs, achy muscles and swollen knees. Descending a steep terrain with this condition got way more demanding. The rhythm with chanting kept me on track. I reached a corner of the mountain surrounded by a large tree and a small track borne left. I had no idea the original A-Z trail continued behind the tree (normally all trails in the Whites are blazed with a specific color [AT is always blazed white], and there was one on a tree that sat beneath the giant tree blocking the view). It was too late for me to realize that I was on a wrong path! With no foothold of solid rocks my trekking poles lost the grip and I tripped on the edge. I hung on to the roots and branches but a few were slack which gravitated me further down. I knew there were two groups coming from Zealand Falls Hut but wasn't sure how far behind they were. Knowing sound travels faraway in the mountains I reached out for my whistle but in vain. Looking down (close to a 400 ft. drop), the thought of falling and brushing against the tree limbs frightened me. At the huts I heard the rescue operation is very difficult and time consuming in White Mountains. Images of the dear ones crowded in mind and I wasn't sure where the hiking adventure in the Whites would lead. It was another terrifying moment! Being an outdoor enthusiastic from childhood I always believed the creator's presence was best revealed through nature. The vastness of the universe, gigantic trees, towering mountains, stunning waterfalls, beautiful sunrise and sunset all give testimony to the creator. In a survival instinct while I was engaged in an intense effort of gymnastics, I prayed to the tree to keep hold of me, and mother earth to secure a footing. Finally, I

was able to lean against the ledge of the mountain and dragged myself up. A lifetime experience of the Whites in A-Z trail, I mumbled.

I returned to the civilized world in AMC Highland Center. The luxury of private room, the warmth of comfy bed, warm water bath and fancy food turned the hiking adventure to 'vacation' at the Highland Center. I indeed missed the call of the wild, its rustic and unfettered nature. The valley was amazing - blinding yellow flames lit the mountains around Crawford Notch. The oaks were angry red bombs scattered among the more common birch and aspen trees and lower down, the maples formed a simmering orange heat. The still lake across the train station drew a lot of visitors who 're busy photographing the beautiful panoramic mirror image.

On the daybreak of Thursday, October 6th I enrolled into an easy hike to Mt. Willard (2864'). Though dwarfed by many of the nearby higher summits of the White Mountains, Mt. Willard offered a classic and legendary view of Crawford Notch that is often featured in travel magazines. Upon my return to Highland Center I embarked on my journey to Mt Washington, the highest peak of White Mountains. Originally I had Tuckerman Ravine trail, the most popular yet challenging route to the summit of Washington, as my first destination. After 5-days of strenuous hiking my legs refused to climb the steep ravine wall. Instead I thought it'd be fun to take the Cog Railway, which spans through the spectacular valleys and peaks of NH, Maine and Vermont. In a crystal clear day, the Cog was overbooked and they were reserving the last ride of the day. "I should have reserved online last night", I thought to myself, but then the attraction of unruly adventure would've gone! With the advent of internet age and the boon of Google, the ultimate charm of travel - 'know the unknown' is already gone. Now, travelers already know all possible information, plan ahead every little thing, see pictures and read blogs. We no longer want to discover anything and hate to be bemused. We want to replicate the comfort of home and even get more in our vacation. However, the real magic, in my mind, is to encounter the undiscovered. Well, this you may call this an adventure but that sets us free from the mundane cage we have been locked in. Having no luck with Cog Railway, I embarked on my journey to Mt. Washington via Auto Road. Driving the Auto Road was about a new experience at every turn, even if I've driven in the mountain roads many times. Weather, foliage, views…they're always changing and kept the trip very exciting. They provide the drivers with an audio tour CD, which engaged as well as distracted me as I turned hairpin bends. Unlike other summits, the peak of Washington was quite busy with two parking lots, observation deck, Cog Railway terminal, weather station, Tip - Top House (a historic former hotel) and visitor center. Being on the tallest peak on the most prominent mountain east of the Mississippi River, the vista from the summit of Mt. Washington was spectacular on a clear day. The journey of Cog Railway on the valley reminded me of toy train in Darjeeling (a town in the West Bengal state, in Himalayan foothills, famous for growing aromatic black tea) that I first rode on in my childhood.

The view with layers of blue mountains in afternoon shadow was truly remarkable as I stopped at an overlook but I didn't know what was waiting! On my way back, I got stuck for hours with piles of cars as a car caught on fire on its way up. However, the wait's worth an opportunity to watch the sunset over Mt Washington. The day ended with a nice meal at Highland Center and peaceful rest.

Friday, October 7th was my last full day to spend in

White Mountains. I started early after breakfast. In the fog the Crawford Notch valley was blurred like a painting drawn by expert hand. The reflection of the surrounded mountains on the lake were silhouetted black while the middle was encircled by twilight. On the other side, a thin sheet of blanket of white hung over the hills. The photographers crowded there with their gears started strangely at me - a hiker with a point and shoot camera! "Been there, done that", I thought as I was enjoying my hiking and honeymoon with slender Leica D-Lux camera after several years of heavy lifting with Nikon gears! I headed off to Arethusa Falls, towering over 100 feet in height, the highest waterfalls in the Whites. Very quiet, the Arethusa Falls trail passed through fine woods. On my way back I hiked downhill to Bemis brook and Coliseum Falls. The water from the falls fell down to the wet rocks, creating smaller cascades as it went down. I sat on a nearby rock and immersed my feet. I began to lose track of time, listening to the humming of the water and noises of nature around me, and finally snapped back into reality when I heard a voice saying "did you lose a lens cap"? Turns out the beauty was so great that I was even losing track of what are usually my most prized possessions- my camera accessories! . My next destination was Pinkham Notch where I stayed at Joe Dodge lodge. On a gorgeous sunny day, the parking lot was full. Many popular trails, including Tuckerman Ravine trail to the summit of Mt. Washington originate from here. I was back into bunk rooms at Joe Dodge lodge but the facility was not rudimentary like the AMC huts. In that afternoon it was too late for me to venture out to the peak of Mt. Washington and I wasn't keen to see the crowds again in the summit. As recommended by Rob and Donna at Greenleaf Hut, I started my journey to Lowe's Bald Spot instead, an outcropping of rock that rises above the surrounding spruce to provide excellent views across the Great Gulf Wilderness. From the Pinkham Notch Visitors Center, I took the Old Jackson Road (the Appalachian Trail south) for 1.8 miles to the Auto Road, and then continued on Madison path for 0.2 miles to the lookout spot. Shortly after the trail crosses Mt. Washington Auto Road, the trail climbs steeply over large rocks to reach the balcony – the view of the Presidential Range was spectacular from here! I met with a thru-hiker who I met at the Greenleaf Hut, "I got lost on my way down from Mt. Washington and spent two nights in valley", he said. Daylight drained away on my way back to Joe Dodge lodge, my ears became sharper and my mind paranoid of a strange feeling of bear footsteps behind me on a quiet trail in dusk. I always carried by bear bell in my pack that aided as rhythm except for this short trip to Lowe's Bald Spot. No I did not get to meet the beast not sure if there was one or it was merely an illusion. At Joe Dodge lodge, I met with three of my roommates – Jean-Pierre, a veteran hiker and teacher from Canada who is visiting New Hampshire every year since 1992 and closing the third round of 48 four-thousand Footer mountains, Albert, a nature enthusiast from New York and a photographer from Texas who left for the whole night to stay in the wilderness to shoot the night sky ("a little crazy", I thought).

The crisp and clear morning of Saturday designated another dazzling day in the Whites. I started my last hike to Lost Pond trail across the visitor center right after breakfast. The chord of melancholy was playing in mind. Still enthralled with the splendor of mountains and the magnificence of fall hues of New England, I wasn't ready to part ways with the Whites. Jean-Pierre suggested me last that on my return to Boston Logan Airport I should visit NH-112, Kancamagus Highway, a 35-mile scenic drive in Northern New Hampshire that is well known as one of the best Fall Foliage viewing areas in the country. It was indeed the showcase of brilliant NH fall foliage. The stretch of Kancamagus Highway drew a pool of visitors on a warm fall day and everyone was greeted with the imprint of bewilderment – every pull-out was presented with a bouquet of vivid fall leaves. I thought the creative artist's pallet was never so rich and grandeur with the celebration of Autumnal fire.

Finally, on the return flight to Chicago, I recorded an account of 40 miles of hiking in the Whites. The seven days in White Mountains opened a new portal in my life. Along with the adoration for outdoor and the passion of nature photography I embraced the challenge of trekking. Hiking the Whites in Appalachian Trail etched a treasured corner in my mind. Now, I would consider this experience as a stepping stone for my next expedition in the Himalayas, getting me one step closer to my childhood dream coming true.

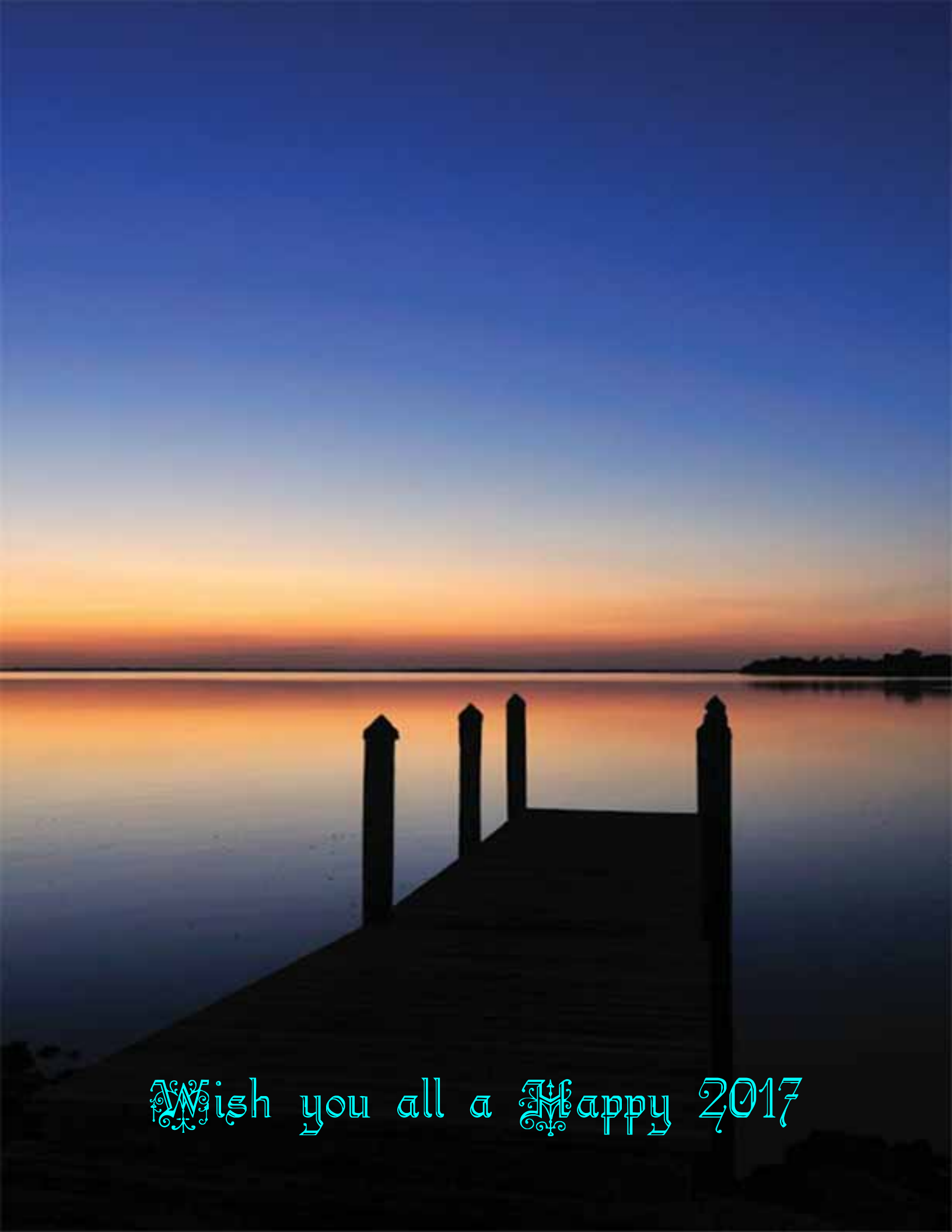
Wish you all a Happy 2017

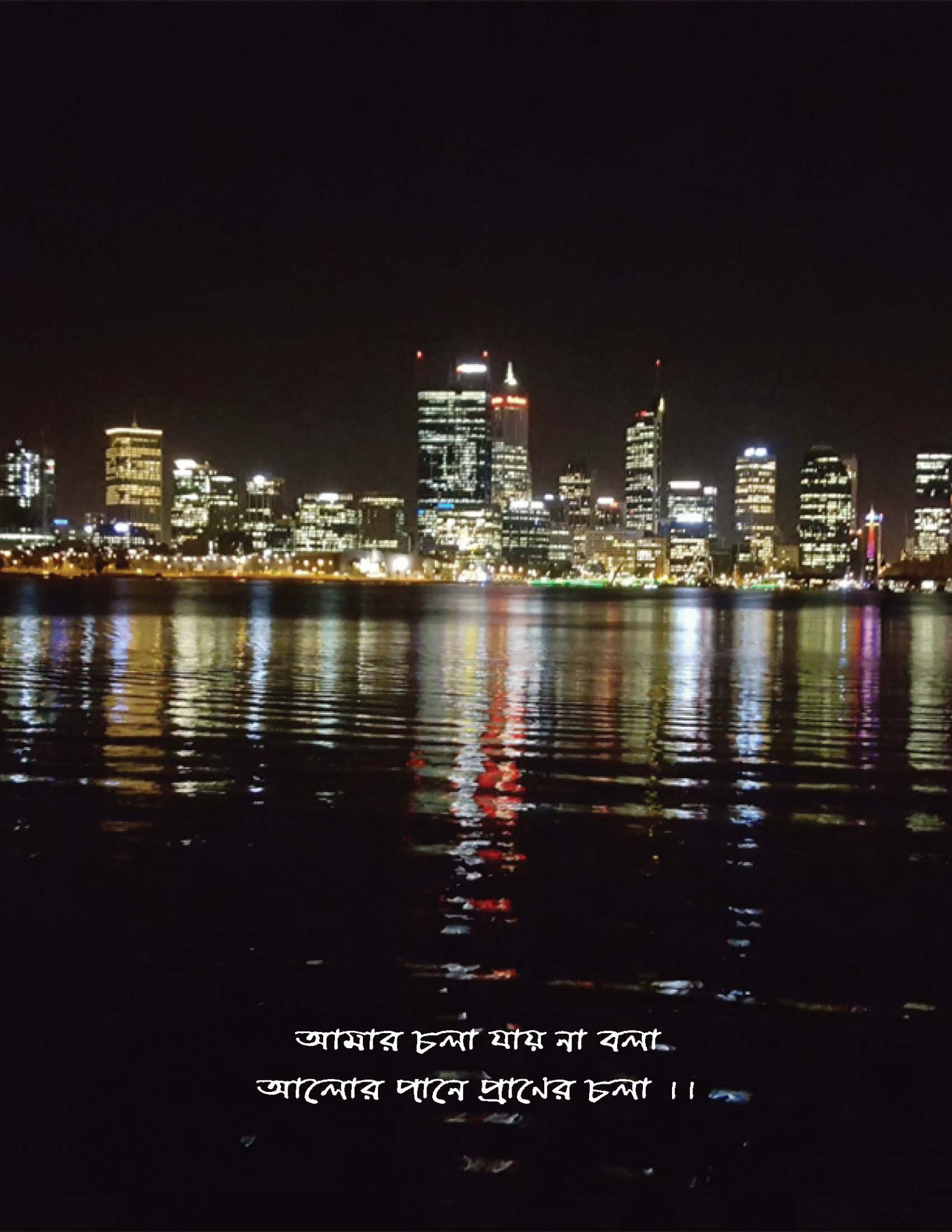

আমার চলা যায় না বলা
আলোর পানে প্রানের চলা ।।